ফুলেরঙ্গ টিকটিকি অফিস

আশাপূর্ণা দেবী

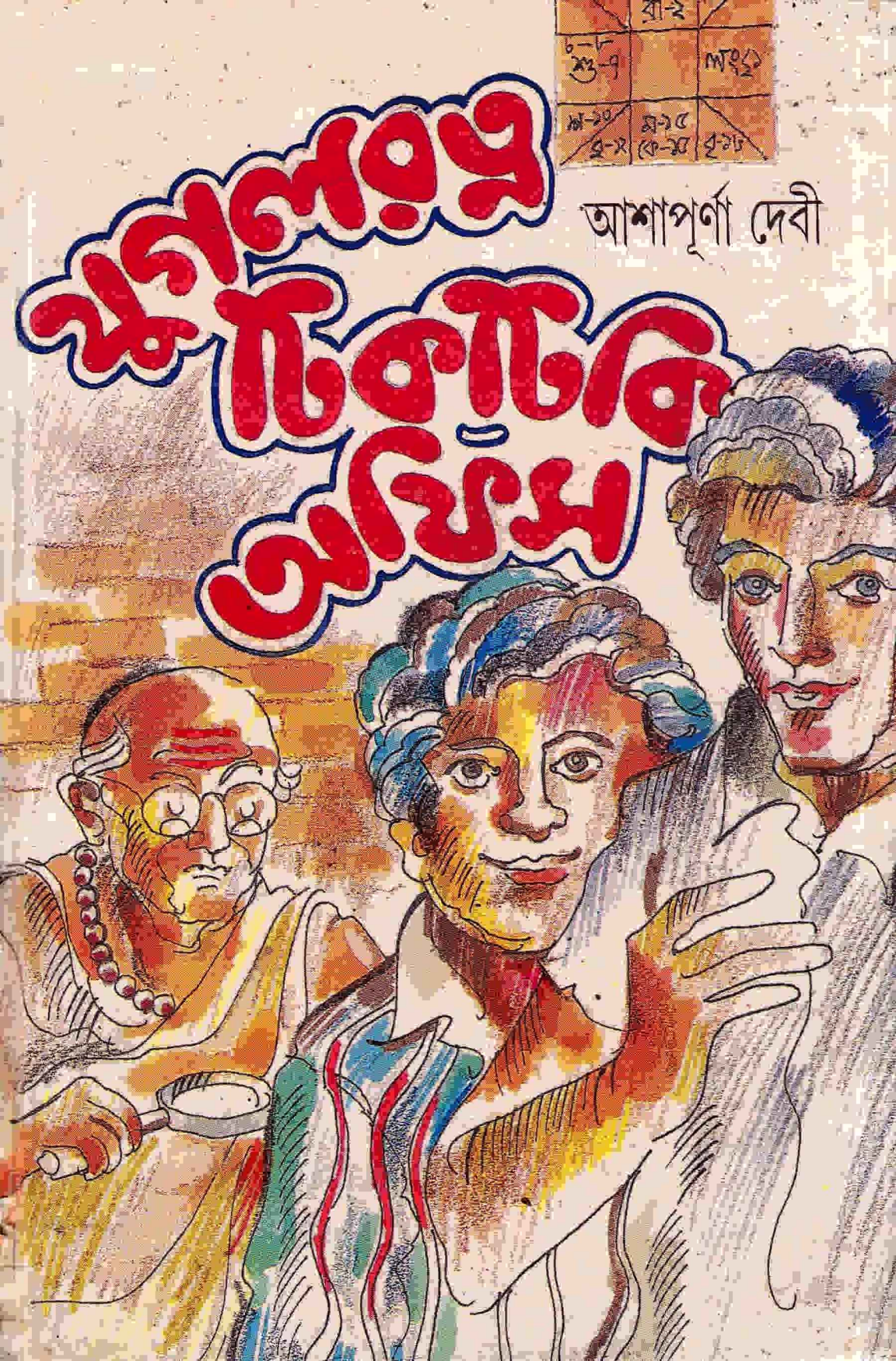

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex Inc., email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.05 09:48:03 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

আকাশ-ছোঁওয়া ফ্ল্যাটবাড়ি গজিয়ে ওঠার জন্য এখন তো আর শহরতলি বা নতুন পাড়া-টাড়ার দরকার হয় না । যেখানে-সেখানে খানিকটা জমি জুটে গেলেই, ব্যস ! দুমদাম ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাওয়া !

এই তো ঢাকুরিয়া কালীবাড়ির কাছ বরাবর যেখানটায় এই সেদিনও খানিকটা খোঁদা-খাঁদা মাঠমতো আর একটা পচা ডোবা ছিল, বলতে গেলে যেন আচমকাই সেখানে দিব্যি খানচারেক পাঁচ-ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে পড়ে আকাশপানে তাকাচ্ছে । এক-একটা বাড়িতে পাঁচটা-পাঁচটা দশটা করে ফ্ল্যাট ! তার মানে-যেখানটায় দু-চারটে ছাগল চরে বেড়াত আর বস্তির লোকেদের বাসন-টাসন মাজা হত ওই জার্ম-ভর্তি পচা জলেই, সেখানটায় এখন গোটাচল্লিশ পরিবার এসে বাসা বেঁধে ফেলেছে ছবির মতো এক-একখানি ফ্ল্যাটে । আর এসব ভাড়া-টাড়ার ব্যাপার নয়, সব নিজস্ব কেনা ।

তবে হ্যাঁ, একসঙ্গে সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে কিনতে হয় না । গোড়ায় বেশ খানিকটা দিয়ে, তারপর ধীরে-ধীরে দিলেও চলে । কম সুবিধে ?

অবশ্য সব ফ্ল্যাটেই যে এক-একটি পরিবার তা ঠিক বলা যায় না । এই যে রাস্তার ওপর সামনেই তিনতলার ফ্ল্যাটের ছোট্ট বারান্দাটায় বেশ ঝাঁ-চকচকে দু'টি যুবক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাড়াটাকে অবলোকন করছে এবং মাঝে মাঝে দু'জনে হেসে-হেসে কিছু কথা বলছে, তারা কিন্তু শুধু ওই দু'জনই । পরিবার বলতে কিছু নেই ! তাও আবার দু'জনে যে একই বাড়ির ছেলে তাও নয়, কারণ দু'জনের দু'রকম পদবি ।

এখানে অবশ্য সকলেই নতুন, কেউ কাউকে চেনে না, চেনার চেষ্টাও করে না । যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত । শুধু যখন রাত্তিরে ওইসব খোপে খোপে আলো জ্বলতে থাকে, এবং এতকালের জন্ম ছায়া জায়গাটাকে যেন দেওয়ালির সন্ধ্যার মতো লাগে, তখন যে যেমন পারে তাকিয়ে দেখে ভাবে, কে জানে এরা কে কেমন ! কে কী কাজ করে ? কার কী পেশা !

তবে এই দুই যুবক এসেই তাদের বারান্দায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ফেলে নিজেদের পেশাটা জানান দিয়ে ফেলেছে ।

বেশ তকতকে ঝকঝকে মাঝারি সাইজের সাইনবোর্ড ।

কিন্তু এখন ওরা আর একখানা বৃহৎ বিশাল সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখছে । এবং দেখতে-দেখতে হেসে-হেসে কিছু পরামর্শ করছে । ওই সাইনবোর্ডটি রাস্তার অপর পারে ঠিক এদের মুখোমুখি একখানা পুরনো আমলের সাদামাটা দোতলাবাড়ির রাস্তার ওপরকার দেওয়ালটা প্রায় জুড়ে সাঁটা ।

পুরনো হলেও বাড়িটা বোধ হয় সম্প্রতি রং করা হয়েছে, নতুন-নতুনই লাগছে, তবে ছাঁচটা তো সেকেলে । রোয়াকের ওপর দরজা, আর দরজায় মাথাজোড়া এবং দু'পাশেও লম্বমান সাইনবোর্ড ।

বলতে কি, এই ক'দিন মাত্র এসে যুবক দুটির ওই বিরাট সাইনবোর্ডসমূহ পড়ে-পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে । পড়তেও তো হয় না । বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই তো চোখে পড়ে । কাজেই পড়া ছাড়া উপায় থাকে না ।

তা চোখে পড়াবার জন্যই তো সাইনবোর্ড । কাজেই সেইভাবেই ব্যবস্থা । বোর্ডের রং স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের

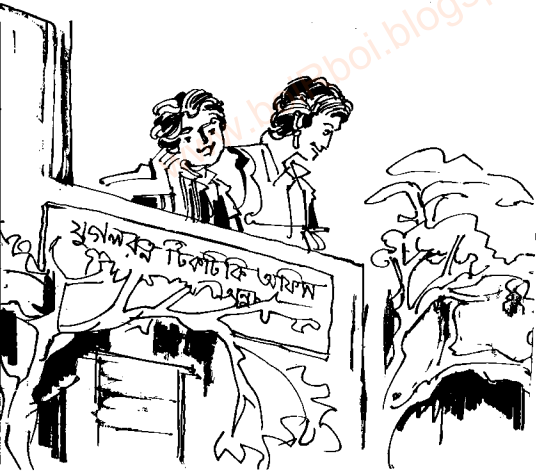

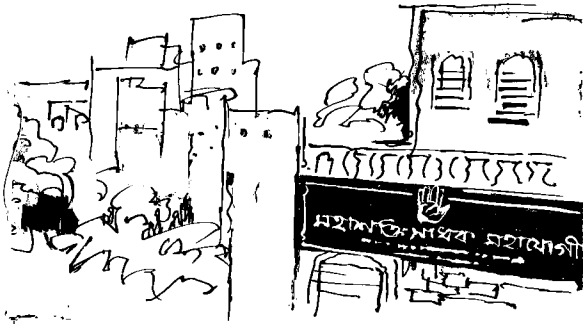

থেকেও ঘন কালো, আর তার গায়ের ছাপ-ছোপ এবং গোটা-গোটা অক্ষরে লেখাগুলি সব দুধ-ধবধবে সাদা ।

হ্যাঁ, ছাপ-ছোপ কিছু তো আছেই । যেমন একেবারে দরজার মাথার কাছে বোর্ডের ওপর দিকে মা-কালীর একখানি বৃহৎ আর লাল-টুকটুকে জিভ-বার-করা মুখোশের ছাপ । ধড় নেই, কেবলমাত্র গলায় হার-পরা মুণ্ডুটি । তার নীচে সেই কবে যেন ভোটের সময় দেশরাজ্য জুড়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে যেমন একখানি হাতের পাঞ্জার ছাপ দেখা যেত, তেমনই বেশ বৃহৎ সাইজের একখানি ডান হাতের পাঞ্জার ছাপ ।

তার নীচে বড়-বড় অক্ষরে মালিকের নাম-মহাশক্তি-সাধক মহাযোগী জ্যোতিষ সম্রাট জ্যোতিঃশাস্ত্রী জ্যোতিষার্ণব শ্রীভার্গব আচার্য !.....নামের নীচে দু'সারিতে একটু ছোট-ছোট অক্ষরে লেখা ইনি কী-কী বিদ্যায় পারদর্শী ! সেগুলো এতটা দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না । তবে দরজার দু'পাশে সরু ফালি সাইনবোর্ডে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ও স্থানের যে নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলি আবার বেশ বড় অক্ষরে । তা থেকেই জানা যাচ্ছে, ইনি বাড়িতে শনি ও মঙ্গলবার ব্যতীত সপ্তাহের বাকি সব দিনগুলিতেই সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত 'সাক্ষাৎ' দেন । আর সন্ধ্যায় সপ্তাহে তিনদিন তিনটি নামকরা জুয়েলারি দোকানে বসেন এবং আর তিনদিন একটি ভাগ্যগণনা কার্যালয়ে । রবিবার বাদ !

কোনখানে কখন ক'টা থেকে ক'মিনিট ওঁর দর্শন মেলে তা মুখস্থ হয়ে গেছে এদের ।

তবে এত কিছুর ধার ধারবার তো দরকার নেই

এদের তো একদম বাড়ির সামনেই । শনি-মঙ্গলবার ছাড়া যে-কোনওদিন সকাল ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে একবার 'জয়-মা কালী' বলে ঝাঁপ দিতে পারলেই হয় ।

এদের ভাবটা যেন এই বারান্দা থেকেই 'হেইয়ো মারি' করে ঝাঁপ দিলেও দেওয়া যায় । পরামর্শ চলছে এসে পর্যন্তই ।

"এই, ওই বুড়োকে একবার বাজিয়ে দেখলে কেমন হয় ?"

"এসব তুই বিশ্বাস করিস ?"

"করি না, আবার করিও । মানে যারা সত্যি জানে-টানে তাদের কেন বিশ্বাস করব না ? তবে বেশির ভাগই তো ভাঁওতার কারবার ! না পড়ে পণ্ডিত !"

"তবে বুড়োর রোজগারপাতি ভালই হয় মনে হয় । তিন-তিনটে জুয়েলারির দোকানে বসে, তা ছাড়া আরও ওই কী যেন একটা 'কার্যালয়' !"

"বাড়িতেও ভিড়ভাট্টা কম হয় না !"

"ইস ! আমাদের যে কবে এ-ধরনের বেশ একখানা স্থায়ী পসার হবে !"

দু'জন যুবকের সাজসজ্জা একই ধরনের হলেও, চেহারায় আকাশ-পাতাল তফাত ! একজনের রং মাঝারি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বেশ কাটা-ছাঁটা মুখ, মুখে বুদ্ধির ছাপ । অন্যজন বেঁটে, বেশ নাদুসনাদুস গড়ন, মুখটি 'গোপাল-গোপাল' 'ভেবলু-ভেবলু' গোছের । রং ফরসার দিকে ! তবে বয়েস দু'জনের একই রকম !

লম্বাজন বলে উঠল, "ওই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে

আমাদের কাজের তুলনা করছিস ? উনি ঘরে বসে যা প্রাণ চায় বলে যান, সেসব কেস মিলল আর না মিলল, তাই নিয়ে চটপট কোনও হিসাবের ধার ধারতে হয় না । আর আমাদের ? 'কেস' কবজা করতে, পায়ে চাকা বেঁধে ঘোরো । মাথা ঘামিয়ে মরো ! যতক্ষণ না সাকসেসফুল হচ্ছে, শান্তি নেই ।"

বেঁটেজন বলল, "তা বটে । তবু ভবিষ্যতে ভাগ্যে কী আছে জানতে সাধ যায় ।"

লম্বা একটু গম্ভীর হাসি হেসে বলে, "ভবিষ্যৎ তো চিরদিনই অন্ধকারের আড়ালে । অতীতটার দিকেই বরং তাকিয়ে দ্যাখ, সেখানে ভাগ্য কী দিয়েছে । ছিলাম দুটো হাভাতে হতভাগা পকেটমার ছোকরা, গুণ্ডা সর্দারের ভয়ে কাঁটা ! আর এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি, দু'খানা টিকটিকি !"

বেঁটে সঙ্গে-সঙ্গে সংশোধন করে, "দু'খানা টিকটিকি নয়, একজন টিকটিকি, আর-একজন তার শাগরেদ ।"

"তোর আর বিনয় গেল না টি. সি. । তুইও কিছু কম না কি ? তো ভেবে দ্যাখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে । সেই গজউকিলের দাবা-বোড়ের খপ্পর থেকে বেরিয়ে পড়ে, জীবনের ওপর দিয়ে কত কী ঘটে গেল । আমাদের যে নিজস্ব এমন একখানা ছবির মতো ফ্ল্যাট হবে তা কখনও ভেবেছিলাম আমরা ?"

বেঁটে, অর্থাৎ যাকে টি. সি. বলা হল, সে হঠাৎ মুচকে হেসে বলে, "এটা কিন্তু ঠিক ভাগ্যের ফলে নয় রে, বলতে পারিস রাগের ফলে ! ঠাকুমা বলতেন, 'পুরুষের রাগই লক্ষ্মী' ।"

"ঠাকুমার কথা তোর এখনও মনে পড়ে ?"

"পড়ে রে । হঠাৎ-হঠাৎ এক-একসময় মনে পড়ে যায় । প্রাণটা কেমন করে ওঠে । তো এইরকম সব কথা বলতেন ঠাকুমা । তার সাক্ষী দ্যাখ । আমাদের সেই মনোহর পুকুরের বাড়িওলা হরিপদবাবুটি যদি অমন একখানি মহৎ ব্যাপার না করতেন, আমরা তেড়েমেড়ে, নিজস্ব ফ্ল্যাটের চেষ্টা করতে আসতুম রে এম. কে. !"

শুনে এম. কে. হো-হো করে হেসে উঠল, "ওঃ যা বলেছিস ! লোক বটে একখানা ! বলে কিনা 'আপনারা মশাই কী মাথামুণ্ডু কাজে গেলেন তো গেলেন, একেবারে দেড়-দু'মাস বেপাত্তা ! এদিকে আমার ওই ভাড়াটে বাসাটাকে নেওয়ার জন্যে লোকে চার ডবল ভাড়া নিয়ে ঝুলোঝুলি । চাবি ভেঙে লোক বসাব না তো করব কী' ?"

হ্যাঁ, ঘটনাটি এইরকমই ঘটেছিল ।

এরা অবাক হয়ে বলেছিল, "দু'মাস কলকাতার বাইরে ছিলাম বলে, আমাদের বাসায় চাবি ভেঙে উটকো লোক বসাবেন ?"

"তা কী করব ? যে নিতে চাইছিল, সে এক বছরের ভাড়া আগাম দেবে বলে সাধাসাধি করে মরেছে তা জানেন ? আমি তো মশাই সাধুসন্ত নই !"

"চমৎকার ! জানেন, এ জন্যে পুলিশ-কেস করা যায় !"

"হ্যা হ্যা হ্যা । করুন গিয়ে । কোর্ট খোলা আছে । তবে ভাড়াটে-বাড়িওলার মামলা, আপনার গিয়ে দশ-পনেরো বছরের আগে তো মিটবে না । ততদিনে কোথাকার জল

কোথায় গড়ায় দেখুনগে ।"

"ঠিক আছে । তো আমাদের জিনিসপত্র ?"

"জিনিসপত্র ? হ্যা হ্যা হ্যা ! আপনাদের আসল জিনিসপত্র বলতে তো মশাই সাজন-গোজনের জিনিস । তো, সেসব তো ঝাঁ-চকচকে দু'খানা সুটকেসে ভর্তি করে নিয়েই রওনা দিলেন । পড়ে থাকার মধ্যে তো ছিল দু'খানা ন্যাতনেতে নেওয়ারের খাট, গোটা-দু'তিন অ্যালুমিনিয়ামের টিফিনক্যারি, আর-একটা জলের কুঁজো, দুটো মগ-বালতি । আর হ্যা হ্যা হ্যা, আপনাদের সেই শখের সাইনবোর্ড ! তো সেসব দামি-দামি জিনিস আমার নিজের বাসার সিঁড়ির তলায় রাখা আছে । নিয়ে যেতে পারেন !"

টি. সি. অগ্নিমূর্তি হয়ে বলেছিল, "নিয়ে যাব মানে ? কোথায় নিয়ে যাব ?"

"সে আপনাদের যেখানে ইচ্ছে ।"

এম. কে. বলেছিল, "টি. সি. চলে আয় । দরকার নেই আমাদের ওসব জিনিসে । ও ওই হরিপদবাবুই ভোগজাত করুন । এবার দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে ।"

ব্যস ।

সেই রাগের ফলেই , এই সিদ্ধান্ত !

তো ভাগ্যক্রমে পেয়েও যাওয়া গেল । আর বলতে কি, হাতে কিছু টাকাও এসে গেছল তখন ।

তবে অবশ্য ওই ছবির মতো ফ্ল্যাটটিই হয়েছে, সাজসজ্জা হয়ে ওঠেনি এখনও । কেবলমাত্র আর দু'খানা ক্যাম্প খাট কেনা হয়েছে, আর একটা জলের কুঁজো ।

রান্নাবান্নার পাট নেই । দু'বেলা বাইরে গিয়ে খেয়ে আসে ! আর কপালজোর, পাশেই একটা চায়ের দোকান আছে, সকাল-বিকেল সেখান থেকে একটা ছেলে দু'বেলা চা-টা দিয়ে যায় । আর সকালে-সন্ধে দু'জোড়া ডিমসেদ্ধ । রুটি-মাখন বিস্কুট চানাচুর ইত্যাদি কেনা থাকে ।

আপাতত এই চলছে ।

তবে টি. সি. তড়িঘড়ি একখানা বেশ জম্পেশ সাইনবোর্ড করিয়ে এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়েছে । সাদার উপর কালো লেখা । তবে এখন বলে, দেখছি ওই বুড়োর মতো কালোর ওপর সাদা অক্ষর বসালে আরও প্রমিনেন্ট হত !

তো যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, তবে চোখে পড়ে না তা নয় । সংক্ষিপ্ত হলেও ঘোরানো !

যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস ।

মেন গেট-এ অনুসন্ধান করুন !

'এম. কে. ডি. ! ও টি. সি. পি. !'

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ওগুলো বুঝি কোনও সাঙ্কেতিক শব্দ, আসলে তা নয়, নামের ইনিশিয়াল ! এম. কে. ডি. অর্থাৎ মদনকুমার দাস ! টি. সি. পি. অর্থাৎ ট্যাঁপাচরণ পাল !

মদন অনেকবার বলেছে, "চল কোর্টে গিয়ে এক-একটা অ্যাফিডেফিট করে নাম-পদবি দুটো বদলে আসি । আজকাল তো এটা দারুণ একটা ফ্যাশন হয়েছে । দোহাত্তা সবাই নাম-পদবি বদলে আসছে ।

ট্যাঁপার সেটা পছন্দ নয় । বলে, "দূর ! হঠাৎ একখানা

নতুন নাম-পদবি ! নিজেকে কি তা হলে 'আমি' বলে মনে হবে ? মনে হবে ভুইফোঁড় !...মনে হবে যাত্রা দলের সাজা রাজা ! ঘরের মধ্যে তুই আমায় দু'বার 'ট্যাঁপা' বলে ডাকবি, আমি তোকে পাঁচবার 'মদনা' বলে ডাকব, মনে জানব, আমি, আমরা !"

"তো তবে তাই মনে কর বাবা !"

"কিন্তু লোকসমাজে ? খবরদার নয় ।"

"সে ওই টি. সি. আর এম. কে. !"

"কেউ যদি বলে, কী বলে যেন ডাকলেন ?"

"ওই ভাই ডাকনামে । বন্ধু তো !"

তো হ্যাঁ, বন্ধুর মতো বন্ধু বটে ! সেই যে কোনকালে দু'জনে একসঙ্গে পালিয়েছিল, তদবধি আর সঙ্গছাড়া নেই !

টি. সি. বলল, "এম. কে. আজ তো শনি-মঙ্গল নয় । যাব-যাব ভাবি, তো চল না একবার বুড়োকে বাজিয়ে আসি !"

এম. কে. বলল, "যেতে চাস, চল । তবে আলতু-ফালতু কিছু বলবি না তো ?"

"আলতু-ফালতু আবার কী ? তবে বললুম তো একটু বাজিয়ে আসি !"

নেমে এল দু'জনে । বেশ তাড়াতাড়িই ।

এখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা । হাতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় । বারোটা বাজলেই শ্রীভার্গব আচার্য ঝাঁপ বন্ধ করবেন ।

ওরা ঝটপট দরজায় চাবি লাগিয়ে, জুতোয় পা গলিয়ে

তিনতলা থেকে নেমে এসে সটান শ্রীভার্গবের মুখোমুখি ।

নামের সঙ্গে 'মহাযোগী মহাসাধক' ইত্যাদি শব্দ থাকলেও আসলে রীতিমত সংসারী মানুষই । বাড়িভর্তি সব লোক । এঁরও পরনে গেরুয়া বা রক্তবস্ত্র-টস্ত্র নয়, দিব্যি ধবধবে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি । তবে পাঞ্জাবিটার ঝুল আর হাতা একটু খাটো ! বিশেষের মধ্যে গলায় একগাছা মোটাসোটা রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে লাল চন্দন এবং সিঁদুরের তিনটি করে রেখা টানা । চোখে সোনালি ফ্রেমের সেকেলে গড়নের চশমা, পায়ের কাছে একজোড়া হরিণের চামড়ার চটি । চেহারাটি বেশ গৌরকান্তি ভারীসারি ।

এদের দেখে একবার চশমার ওপর থেকে এবং আর একবার চশমার নীচে থেকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবা ?"

ঝকঝকে সুটপরা যুবক খদ্দের দেখে কিছু বিচলিত হলেন বলে মনে হল না । হবেনই বা কেন ? বলে কত বিলেত-আমেরিকা ফেরত তরুণ-তরুণী খদ্দেরকে তিনি সর্বদা গুলে খাচ্ছেন । তাঁর সেই জুয়েলারির দোকান, 'রত্নমন্দির' 'নবরত্ন' আর 'রত্নালয়'গুলিতে তো সাহেব মেমসাহেবদেরও হরদম আসতে দেখা যায় ।

ট্যাঁপা তাড়াতাড়ি বলে, "এই যে সামনেই থাকি আমরা ।"

"অ । পাড়ায় নতুন এসেছ ? বোসো । বলো, কী বলবে?"

মদনাকে কিছু বলবার সুযোগ ট্যাঁপা বড় একটা দেয় না । তাই, তাড়াতাড়িই বলে, "এই একটু ভাগ্যটা

জানতে ... ”

“বেশ, বোসো । কোষ্ঠীপত্র কিংবা জন্মপত্রিকা এনেছ ?”

“অ্যাঁ ? কোষ্ঠী ? মানে যাকে ঠিকুজি-কুষ্ঠী বলে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ।”

“বাঃ, সে আবার আমরা কোথায় পাব ? ওসব আমাদের নেই-টেই । হাত দেখে যা বলবার বলুন ।”

শ্রীভার্গব গম্ভীর হাস্যে বলেন, “কিন্তু বাড়িতে তো আমি হাত দেখি না । শুধু কোষ্ঠী বিচারই করি বাপু !”

এখন মদনা বলে ওঠে, “বাঃ ! এই তো লেখা রয়েছে শনি মঙ্গলবার বাদে আর সবদিন ... ”

“হ্যাঁ, তার সঙ্গে আরও যা লেখা রয়েছে দ্যাখোনি মনে

হচ্ছে । দ্যাখো, লেখা রয়েছে, ‘কেবলমাত্র কোষ্ঠী বিচার করা হয়’ !”

তাই বটে । এখন চোখ পড়ল ।

ট্যাঁপা জেদের গলায় বলে, “তা যদি কারও ওসব ঠিকুজি-কোষ্ঠী না থাকে ?”

“সঠিক জন্মসময়টা দিয়ে গেলে করে নিতে পারি ।”

“জন্মসময় ! সঠিক । হায় কপাল । সেসব কোথায় পাব ঠাকুরমশাই ? কে লিখে রেখেছে যত্ন করে ? আমাদের কেউ নেই-টেই । তো এত-এত টাইটেল, আর হাত দেখতে জানেন না ? আচ্ছা মজা তো ।”

মদনা চাপা গলায় বলে, “আঃ টি. সি. !” কিন্তু টি. সি-র কি আর ওইটুকু দাওয়াইতে কাজ হয় ? সে

ততক্ষণে তড়বড়িয়ে বলে ওঠে, "তার মানে স্পেশালিষ্ট ডাক্তারবাবুদের মতন । আগে ব্লাড রিপোর্ট, ইউরিন রিপোর্ট, হ্যান রিপোর্ট, ত্যান রিপোর্ট হাতে দাও তবে রুগির চিকিচ্ছে করব । কোবরেজরা তো নাড়ি দেখেই সব ... "

এখনও চিকিৎসাকে 'চিকিচ্ছে' বললেও জেনে ফেলা ইংরেজি বিদ্যেটুকু সে কাজে না লাগিয়ে ছাড়ে না ।

শ্রীভার্গব কি চটে উঠলেন ?

নাঃ । বরং যেন একটু কৌতুকের দৃষ্টিতেই ছেলেটাকে বেশ অভিনিবেশ করে দেখে মৃদু হেসে বলেন, "তা হলে তো বাপু তোমাদের ওই কোবরেজের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল ।"

"কী আশ্চর্য ! আমরা কি সত্যি রুগি যে, কোবরেজের কাছে যাব? ওটা তো কথার কথা ! বলছি, হাতই যদি দেখতে জানেন না তো এত টাইটেল কিসের ?"

"জানি না তা তো বলিনি বাপু ? তবে এখানে দেখি না । তার জায়গা হচ্ছে ভবানীপুরের গিরিশ মুখুজ্যে রোডের মোড়ে 'ভাগ্যগণনা কার্যালয়' ।"

"বাঃ । সেখানে দেখতে পারেন, আর এখানে দেখলেই দোষ ?"

শ্রীভার্গব তেমনই হাস্যবদনে বলেন, "দোষ বলে কিছু না । ওটাই নিয়ম করা হয়েছে । জীবনের সব কিছুতেই একটা নিয়ম থাকা দরকার তো ।"

ট্যাঁপা মনে-মনে একটু মুচকি হেসে ধাঁ করে বলে ওঠে, "তো আমাদের ওপর দয়াধর্ম করে নিয়মটা একটু ভাঙুন না ঠাকুরমশাই । আমার এই বন্ধুটির ছেলের খুব

অসুখ, তাই ... "

এইটাই বলবে বলে মনে মনে ঠিক করে এসেছিল । ভেবেছিল হয়তো খুব অসুখ শুনেই মাদুলি-কবচ কি বড়সড় কোনও হোমযজ্ঞির ব্যবস্থা বাতলাবেন, কিন্তু তা হল না ।

কথাটা শোনামাত্রই শ্রীভার্গবের মুখের কৌতুক ভাব উবে গিয়ে ফস করে যেন দু'চোখে দেশলাইকাঠি জ্বলে উঠল । অগ্নিশর্মা মূর্তিতে বলে উঠলেন, "ওঃ মশকরা ! আমাকে পরীক্ষা করতে আসা হয়েছে ? ছেলের অসুখ ! দু'জনেই তো দেখছি 'আনম্যারেড' । তোমাদের মতো বিচ্ছু ছেলেপুলে আমার ঢের দেখা আছে । আচ্ছা, এখন আসতে পারো ।"

'আসতে পারো' মানেই অবশ্য 'যেতে পারো' ।

এম. কে. ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'কিছু দোষ নেবেন না ঠাকুরমশাই, আমার এই বন্ধুটি একটু বোকা-চালাক গোছের আছে, ওইরকমই কথা ওর । কিন্তু ঠাকুরমশাই হাত কি কোষ্ঠী না দেখেই কী করে বুঝলেন আমরা মানে আমাদের ইয়ে ... "

"দ্যাখো বাপু, ওটুকু বুঝতে হাত, কোষ্ঠী কিছুই দেখতে হয় না, কপাল দেখলেই বোঝা যায় । তবে এমন সব বাজে পার্টির সঙ্গে আমার কারবার নেই । যেতে পারো ।"

হঠাৎ ট্যাঁপা দুম করে শ্রীভার্গবের পায়ের কাছে মুণ্ডু হেঁট করে একটা প্রণাম ঠুকে বলে ওঠে, "মাফ করে দিন ঠাকুরমশাই ! অবোধ অজ্ঞান বলে মাফ করে দিন । আপনার সেই ভবানীপুরে তো আবার সেই বুধ শুক্র সোম। অতদিন ধৈর্য ধরতে পারা যাবে না ! ক্ষমা-ঘেন্না করে

হাতটায় একটু চোখ বুলিয়ে দিন । এই হাতের রেখাটুকু ভিন্ন আমাদের তো আর কোনও সম্বল নেই । কবে জন্মেছি তার হিসাব ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না ।"

মদন একটু জোর দিয়ে বলে, "আঃ । ওঁকে ব্যস্ত করছিস কেন ? না হয় সেই বুধ কি শুক্রতেই হবে ... "

শ্রীভার্গব এখন শান্ত গলায় বলেন, "তাও হবে না । সামনের সপ্তাহে আমার বাড়িতে একটি শুভকাজ, এক সপ্তাহ ছুটি । ঘরে-বাইরে কোথাও কোনও কাজ নয় ।"

"অ্যাঁ ! তার মানে সব ঝুলে গেল ! দেখলি এম. কে. আমাদের কপালজোর ? হবেই তো, অভাগার কপাল বই তো নয় ।"

শ্রীভার্গব কী ভেবে বলেন, "ঠিক আছে, এখনই তোমার হাতটা একটু দেখে দিচ্ছি । তবে..." ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "সময় আর বেশি নেই । কই দেখি হাতটা ..."

ট্যাঁপা তাড়াতাড়ি বলে, "না না, আমার থাক । আমার এই বন্ধুরটাই বরং দেখুন ! ওই আসল ।"

মদন রেগে গিয়ে বলে, "আঃ টি. সি. । সময়ের বাজে খরচ করছিস কেন ? তোরই তো বেশি বেশি—না হয় তো চল ।"

ট্যাঁপা আস্তে হাতটা বাড়িয়ে ধরে ।

শ্রীভার্গব তাঁর কাছে রাখা একটা কাঠের হাত-বাক্স থেকে আলাদা একটা চশমা বের করেন, এবং একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ! চশমাটি বদলে হাতটা ধরে নিয়ে বলেন, "নাম কী ?"

"নাম ? আজ্ঞে ইয়ে টি. সি. পি. !"

"টি. সি. পি. ! এটা আবার কীরকম নাম ? বাঙালি তো ? না কি ?"

তখন মদন হাল ধরে । তাড়াতাড়ি বলে, "আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, নামটা ওর তেমন জুতের নয়, তাই লজ্জায় বলতে পারে না । আসলে ছেলেবেলায় ..."

শ্রীভার্গব গম্ভীরভাবে হাতের রেখা নিরীক্ষণ করতে-করতে বলেন, "ঠিক আছে । বুঝে নিয়েছি । শৈশবকাল তো দেখছি একদম অন্ধকার ! শৈশবে মাতৃপিতৃহীন, অতিদারিদ্র ! তা ছাড়া নীচজনের সংসর্গ । ... আরে বাবা, কী ব্যাপার ? হাত তো বাবু খুব গোলমেলে । চুরি-ছিনতাই পকেট মারা-টারার অভ্যাস ছিল না কি ?"

"ঠাকুরমশাই । আপনি দেবতা !"

ডুকরে ওঠে ট্যাঁপা ।

শ্রীভার্গব কিন্তু এখন যেন অন্য লোকে বিচরণ করছেন । আপন মত জানান—আপনমনে বলেন, "তবে ভাগ্য অনুকূল । জীবনে দু-একজন মহতের সংস্পর্শে এসে জীবন বদলে গেছে মনে হচ্ছে । একেবারে বিপরীত ! তো এখন কী করা হয় বলো তো বাবা ? পুলিশের চাকরি-টাকরি না কি? সেই ধরনের মনে হচ্ছে যেন । সামনে বেশ বড় একটা 'সাকসেস' দেখছি । কী কাজ ?"

ট্যাঁপা অবসন্নভাবে বলে, "তুই বল এম. কে. । আমার মাথা ঘুরছে । পৃথিবীতে এমন বিদ্যেও আছে ?"

মদন ইতস্তত করে বলে, "না, মানে ঠিক পুলিশের

চাকরি নয়, তবে ..."

ঠিক এই সময় বাড়ির সামনে ঝড়াং করে একটা সাইকেল থামে। একটি ছোকরা তা থেকে নেমে পড়ে বলে ওঠে, "কী ব্যাপার, জেঠু ? আপনি এখনও চশমা-টশমা পরে বসে ? বারোটা তো বাজে !"

জেঠু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলেন, "হ্যাঁ। এই এঁরা একটু বিলম্বেই এসেছেন ... "

সেই ছোকরা এদের দু'জনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বিরস গলায় বলে, "আপনারা ওই সামনের নতুন ফ্ল্যাটের টিকটিকি অফিসের না ?"

জেঠুর ভাইপোর ধরনটা একটু মস্তান মতোই।

জেঠু বিশেষ চশমাটি খুলতে-খুলতে ভুরু কুঁচকে বলেন, "কিসের অফিস ?"

"টিকটিকি অফিস ! মানে গোয়েন্দা অফিস। এঁরা হচ্ছেন যুগলরত্ন গোয়েন্দা। কী ? তাই না ?"

মদন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ, আচ্ছা ঠাকুরমশাই, নমস্কার। আপনাকে একটু বিরক্ত করা হল।"

ট্যাঁপাও উঠে পড়ে। একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওই ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বলে, "বারোটা বাজতে এখনও বারো মিনিট বাকি ছিল। ততক্ষণে আর-একটু কিছু জানা যেত। সাধে বলেছি কপাল। আশা ছিল ভবিষ্যৎটা একবার ... "

শ্রীভার্গব হঠাৎ খুব সদয় গলায় বলেন, "দ্যাখো বাপু, তোমাদের আমি দেখব। ভাল করেই দেখব। সামনের

সপ্তাহ বাদে। বাড়িতে একটি শুভকাজ রয়েছে। আমি তোমার নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করে ভাগ্যগণনা করে দেব !"

"শুধু আমার নয়। এরও। দু'জনার এক ছাঁচেরই কপাল।"

বলে ট্যাঁপা আর একদফা হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভাইপোর দিকে আর-একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মদন তো ততক্ষণে রাস্তায়।

হনহন করে পা চালাচ্ছে মদন।

ট্যাঁপা কাতর ভাবে বলে, "এই এম. কে. ! এখন আর বাসার দিকে যাচ্ছিস কেন ? একেবারে 'সুস্বাস্থ্য ভোজনালয়ে'-ই চলে যাওয়া হোক। পেটের মধ্যে তো মোটরবাইক চলছে !"

মদন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, "তুই যা ! আমার খিদে নেই।"

"হেই এম. কে. দোহাই পাড়ি। অত রেগে যাস না। চলে আয় এদিকে।"

মদন অবশ্য চলে আসে, তবে খুব রাগের গলায় বলে, "যা বারণ করেছিলাম, তাই করলি। চেহারা দেখেই বুঝতে পারিসনি কেমন লোক ! তাঁকে বাজাতে গেলি ?"

"হ্যাঁ, দেখে ভক্তি আসার মতো। তবে ওই যে কথাটা গিয়েই বলব বলে ভেবে গেছলাম। তো দেখলাম, গুণী ব্যক্তি তো, দ্যাখ যদি বা আমাদের প্রতি সদয় হল তো, অমনই বাড়িতে শুভকাজ।"

কথা বলতে-বলতে সুস্বাস্থ্য ভোজনালয়ে চলে আসে।

www.boiRboi.blogspot.com

এইটিই ওদের দু'বেলার ভোজনের জায়গা ।

শ্রীভার্গবের ভাইপো সাইকেলটা ঘরে তুলে বলে, "ওই বাজে লোক দুটোর ওপর আপনার হঠাৎ এত মায়া যে ?"

জেঠু তাঁর সরঞ্জাম তুলে ফেলে, হরিণের চামড়ার চটিতে পা গলাতে-গলাতে হেসে বলেন, "বাজে, এ-কথা কে বলল তোকে ?"

"বাজে না তো কী ? ওইরকম একটা ফ্ল্যাটে শুধু দু'জন থাকে । রাস্তার দোকান থেকে যা আনায়, আর দু'বেলা হোটেলে খেয়ে আসে । কাজকর্মের তো বালাই দেখি না । আবার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঃ যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস ।"

জেঠু আর-একটু হাসেন, "তাতে কী ? বাইরে থেকে কি সবাইকে বোঝা যায় ? এই যে তুই একখানা কী মানিক, তা দেখে কেউ বোঝে ? সবাই বলে 'আড্ডাবাজ, চারশো বিশ, ফেলমারা মস্তান' ..."

"কী ? এইসব বলেন আমায় আপনারা ?"

"আহা । আমি কি আর বলি ? লোকে বলে । তোর মা-বাপই বলে । তবে ওর মধ্যে যার হাতটা অন্তত দেখলাম তোদের ভাষায় 'ভেরি ইন্টারেস্টিং' । সামনেই যে আবার কাজ পড়ছে, না হলে কালই আবার দেখতাম । খুকুরানির বিয়েটা মিটে গেলেই ওদের ডাকিয়ে, ভাল করে দেখতে হবে, বুঝলি চাঁদু ।"

চাঁদু বেজার গলায় বলে, "দেখবেন । আমার কী ! তবে

আমি শিওর, ওরা লোক সুবিধের নয় ।"

"কেন রে ? তোর কী এমন পাকা ধানে মই দিয়েছে ? ভাবছি বিয়েতে ওদেরও একটা নেমন্তন্ন-চিঠি দিলেও হয় । আহা দু'বেলা হোটেলে খেয়ে মরে ।"

"তা দেবেন ! তবে বলে দিচ্ছি আমার দ্বারা হবে না । কে তার ঠিক নেই । বিয়ের নেমন্তন্ন । হ্যাত !"

যদিও রাগ দেখিয়ে 'খিদে নেই' বলেছিল, তবু মদন বেশ জম্পেশ করেই খেল । ট্যাঁপা তো খাবেই । তার তো পেটের মধ্যে মোটরবাইক চলছিল ।

বিল মেটাতে-মেটাতে মদন ভুরু কুঁচকে বলে, "দামটা আজ যেন বেশি ধরা হয়েছে মনে হচ্ছে।"

বিল-সরকার গলার স্বর নামিয়ে বলে, "আর বলবেন না ভাই ! কর্তা এমন চোখের চামড়াহীন ! আপনারা ডেলির খদ্দের, তবু এই ব্যবহার। ওই যে বাড়তি একবার ডাল চেয়ে নিয়েছিলেন। একমাত্র ভাত, জল আর লবণ এই তিনটি বাড়তি নিলে, এক্সট্রা দিতে হয় না, তা ছাড়া যা কিছু ... "

হঠাৎ থেমে যায়।

মালিক হাস্যবদনে এসে দাঁড়ান।

"এই যে, আপনাদের হয়ে গেছে। তা হলে টেবিলটা, মানে অন্য খদ্দের অপেক্ষা করছে তো। ওরে নন্দ, টেবিলটা চটপট সাফ করে ফ্যাল।"

এরা দু'জন চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে।

আর ট্যাঁপা ব্যঙ্গের গলায় বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলে আয় এম. কে. ! আর বসলে হয়তো টেবিলে বাড়তি সময় নেওয়া হয়েছে বলে 'এক্সট্রা বিল' এসে যাবে।"

মালিক থমকে বলেন, "কী বললেন ?"

"কিছু না। কিছু না, ও আমাদের ব্যক্তিগত কথা।" বলে ট্যাঁপাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলে আসে মদন।

বাড়ি ফিরে মদন গম্ভীর ভাবে বলে, "আচ্ছা ট্যাঁপা, তুই কি কিছুতেই স্বভাব বদলাতে পারবি না ? লোককে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার জন্যে যেন সর্বদা মুখিয়ে থাকিস। কেন বল তো ?"

ট্যাঁপা অম্লান বদনে বলে, "নিজেই তো বললি স্বভাব। তা স্বভাব তো শুনেছি মরলেও যায় না। দ্যাখ না ঠাকুরমশাইয়ের ওই ভাইপোটাকে যদি একদিন হাতে পাই তো, কীরকম শুনিয়ে দিই। কীভাবে আমাদের সম্পর্কে হেনস্থা করে কথা বলল দেখিসনি তো ?"

"দেখব না কেন ?"

"তবে ?"

"ধরে নিলাম ওটাও ওর স্বভাব।"

"তুই যে দেখছি ক্রমশ মহাপুরুষ বনে যাচ্ছিস। আমি বাবা রাগ দমন করতে পারি না। এই দ্যাখ না, এখন ভাগ্যের ওপর কী রাগ হচ্ছে। এতকাল গেল, যেই না আমরা একটু হাত দেখাতে গেছি, অমনই ওঁর বাড়িতে শুভকাজ গজিয়ে উঠল ! ভগবান জানেন কী শুভকাজ !"

তা কী শুভকাজ পরদিন থেকেই জানতে পারা গেল। শ্রীভার্গবের নাতনির বিয়ে। অবশ্য আসলে ভাইয়ের নাতনি। নিজের নাতনি আর কোথায় পাবেন ? বিয়েটিয়ে তো করেননি। দু-তিনজন ভাই আছে বাড়িতে, তাদেরই সংসার। শ্রীভার্গব শুধু খরচপত্র করবার কর্তা। তা টাকা তো কম উপার্জন করেন না। সংসারে তাই বেশ জমজমাট ভাব। এই যে নাতনির বিয়ে হচ্ছে, তার ঘটাপটা কি কম হচ্ছে ? ছাতে প্যাণ্ডেল, বাড়ির পেছনে যে অনেকটা ফালতু জমি পড়ে ছিল তাতে প্যাণ্ডেল। ডেকরেশনের কী বাহার করছে। বাড়ির সামনেটা টুনি বালবের মালায় একদম ঘিরে ফেলেছে। আর সর্বদা জিনিস আসছে। কখনও প্যাকেট-প্যাকেট, কখনও মুটের মাথায় ঝাঁকা-ঝাঁকা।

এরা বারান্দা থেকে সব কিছু—

না, বিয়ের নেমন্তন্নপত্তর এদের দিয়ে যায়নি কেউ ।

চাঁদুর প্ররোচনায় বাড়ির অন্যরাও বলেছে, চেনাজানা নেই, হঠাৎ দুটো উটকো ছেলেকে আবার নেমন্তন্ন করে বাড়ির মধ্যে আনার দরকার কী ? ছেলে দুটোকে দেখে তো সুবিধের মনে হয় না । একটা যেন তালগাছ, আর একটা বেগুনগাছ ।

শ্রীভার্গব অবশ্য একবার বলেছিলেন, "চেহারার ওপর কি মানুষের নিজের হাত থাকে ? একজনের তো অন্তত হাত দেখলাম, ভাল ছেলে । খাঁটি ছেলে । খুব খারাপ পথ থেকে যারা চলে আসতে পারে ..."

"খুব খারাপ থেকে মানে ? আগে খারাপ ছিল তা হলে ?"

চাঁদু স্কোপ পায় ।

জেঠু বলেন, "আরে বাবা, পাকেচক্রে কার জীবন যে কেমন হয়ে যায় । আমি তো ঠিক করেছি, খুকুরানির বিয়েটা মিটে গেলেই আমি ওদের ব্যাপারটা ভাল করে দেখব ।"

হায় ! জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিঃশাস্ত্রী ! অন্যের ভূত ভবিষ্যতের বিষয় এত জেনে ফেলতে পারো তুমি, আর নিজের ব্যাপারে ?

না, নিজের ব্যাপারে যে একেবারেই অন্ধকারে থাকেন সেটি বোঝা গেল ওই ঘটনাটার পরদিন সকালেই ।

অনেক রাত পর্যন্ত গেছে লোকের ভিড়, গাড়ির ভিড় ! এবং তারপর বাসরঘরের গানটানের আওয়াজ । শেষ

রাত্তিরের দিকে একটু স্তব্ধতা এসেছিল । খুব ভোরবেলা পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলো বিয়েবাড়ির কাছাকাছি ডাস্টবিনটার ধারে ঘোরাঘুরি করছিল, আর মাঝে-মাঝে ঘেউ-ঘেউ করছিল ।

হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা চিরে ফেলে একটা আর্তনাদ উঠল । একটা গলার আর্তনাদ নয়, যেন অনেক গলার ।

হ্যাঁ, বাড়ির প্রায় সব লোকই শ্রীভার্গবের নীচের তলার ওই একান্ত নিজস্ব ঘরখানির মধ্যে ঢুকে এসেছিল । আর চেঁচিয়ে উঠেছিল । যে সাহস কখনও কারও না হয়েছে ।

আসলে রাস্তার সামনের ওই 'দর্শন' ঘরখানির ঠিক পেছনে টানা লম্বা যে ঘরখানি—সেটি শ্রীভার্গবের শোবার ঘর এবং পুজোর ঘরও । স্নানটান না করে কেউ বড় একটা এ-ঘরে আসতে হুকুম পায় না ।

ঘরটির চেহারা এই ঃ একদিকের দেওয়ালধারে একদম দেওয়াল ঘেঁষে একটি হাতখানেক উঁচু শ্বেতপাথরের বেদিতে আর একটি কালো কষ্টিপাথরের তিনকোনা ইঞ্চি তিনেক উঁচু বেদি বা পিঁড়ির ওপর শ্রীভার্গবের ইষ্টদেবী মহাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । মাপে খুব বড় কিছু নয়, উচ্চতা ফুট-আড়াই । তাও বোধ হয় মুকুটসমেত । যদিও সাধারণত মা-কালীর মূর্তিতে শুধু একরাশ এলোচুলই দেখা যায়, কিন্তু শ্রীভার্গবের পূজিতা ওই দেবীর মাথায় সোনার মুকুট পরানো থাকে । কোনও এক ধনী ভক্তের দেওয়া । মুকুটটির আবার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঠিক মাঝখানটিতে একটি ছোট্ট রঙিন বালব ফিট করা আছে । এবং তার সঙ্গে ভেতরে আছে ব্যাটারির ব্যবস্থা । কাজেই রাত্তিরে মুকুটের মাঝখানটিতে জ্বলজ্বল

করে একটি লাল আলো জ্বলে ।

বেদিটির নীচে দুটি ধাপ, তার ওপরেই দু'থাকে সাজানো থাকে ধূপদানি, কোশাকুশি, পঞ্চপ্রদীপ, শাঁখ, ঘণ্টা ইত্যাদি । পাশের দেওয়ালে একটি আংটায় বেশ বড়সড় একটি চামর ঝোলানো থাকে ।

দেবীমূর্তির পেছনটায় চালচিত্রের বদলে দেওয়ালে একটি লাল শালু সাঁটা, তাতে সাদা রেশমের কারুকার্য করা বর্ডার ।

ঘরের এপাশের দেওয়ালের নীচে যে দেওয়ালে দুটি বড়-বড় জানলা বাড়ির পাশের প্যাসেজের ওপর, সেই জানলার নীচে একখানি সরু চৌকিতে শ্রীভার্গবের বিছানা । সাদামাটা যৎসামান্য উপকরণ । মাথার দিকে একটি বালিশ, পায়ের দিকে একটি ছোট তাকিয়া । দিনের বেলা বালিশসমেত বিছানাটার সবটাই ঢাকা থাকে বেডকভার বা সুজনির বদলে একটি কালী নামাঙ্কিত লাল নামাবলী দিয়ে । ওই বিছানার ধারের জানলার নীচে বাঁ পাশে যে প্যাসেজটা সেটা বেশ চওড়া । কারণ ওটাই সাধারণত বাড়ির সকলের আসা-যাওয়ার পথ । সদরের ঘরটা তো শ্রীভার্গবের চেম্বার । তবে টানা লম্বা রোয়াকের ওপর ওই টানা লম্বা ঘরখানায় রোয়াকের ওপরই দুটো দরজা আছে । একটার সামনাসামনি শ্রীভার্গব চৌকি পেতে বসেন । অপরটা বাড়ির লোক নেহাত দরকারে ব্যবহার করে । প্যাসেজের শেষপ্রান্তে আবার বাড়ির বাসনটাসন মাজার জায়গা, কল-চৌবাচ্চা, তাই ওইসব কাজের সময় বাড়ির লোকের কেউ কেউ এই চেম্বার-ঘরের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে । তবে চাঁদু প্রায়

সর্বদাই । তার মতে প্যাসেজে শ্যাওলা । সে যখন-তখনই বায়না করে, "ওটাকে মোজাইক টাইল দিয়ে বাঁধিয়ে দিন তো জেঠু ! তা হলে ভক্তি আসবে ।"

কিন্তু এতকালের বৃহৎ পুরনো বাড়ি, যার আগাগোড়াই ফাটা-চটা লালরঙা সিমেন্টের মেঝে, হঠাৎ তার পাশের প্যাসেজটা মোজাইক টাইলস বসিয়ে কী হবে ? জেঠু তেমন গা করেন না ।

জেঠু যেটা ভাল বোঝেন সেটায় গা করেন । যেমন ওই যে জানলা দুটো, যেটা দক্ষিণ দিক বলে ভালই হাওয়া আসে এবং শ্রীভার্গব রাত্রে ঘরে পাখা চালানোর বদলে ওই জানলা দুটো খুলে রাখাই শ্রেয় মনে করেন, সেই জানলা দুটোর সাবেকি লোহার গরাদ উপড়ে ফেলে, খুব মজবুত আর জটিল নকশার ঘন কারুকার্য করা গ্রিল বসিয়ে নিয়েছেন, এবং তা সত্ত্বেও 'কাক ঢোকে বেড়াল ঢোকে' এই ছুতোয় শক্ত লোহার জাল বসিয়ে নিয়েছেন ।

জানলার কপাট ?

সেও একটু অদ্ভুত । যদিও সাবেকি কাঠের কপাটই আছে, যাকে বলা যায়, 'লোহাকাঠ', তবু তার ভেতর দিকটায় পাতলা স্টিলের চাদর লাগিয়ে নিয়েছেন ।

দেখে আত্মীয়রা কেউ-কেউ হেসে-হেসে বলেন, "আপনার ঠাকুরের জন্যে যা করে রেখেছেন । উঃ ব্যাঙ্কেও এত প্রিকশান নেওয়া হয় না ।"

তবে ব্যাপারটা তো নেহাত যুক্তিহীন নয় । শ্রীভার্গবের কালীমূর্তিটির শুধু যে মাথায় সোনার মুকুটটিই আছে তাই নয়, আরও অনেক গয়না আছে । সোনার মুণ্ডমালা,

রত্নখচিত চুড়ি বালা, গলায় মুক্তো বসানো সোনার চিক, আর পায়ের তো বোধ হয় সাত জোড়া গয়না সোনা-রূপোয় মিলিয়ে ।

ভক্তরা দেয়, নিজেও করিয়েছেন কখনও-কখনও সাধ করে । যেমন এবারে নাতনির বিয়ে উপলক্ষে একজোড়া জমকালো রূপোর পাঁয়জোর গড়িয়ে দিয়েছেন । এসব গয়নাগাঁটি অবশ্য সব সময় পরিয়ে রাখা হয় না । পরানো হয় বিশেষ পুজোটুজো উপলক্ষে । সেসব এই ঘরের মধ্যেই কোনও গুপ্তস্থানে লুকনো থাকে । বাড়ির লোকের মধ্যেও নেহাত বিশ্বস্তজন ছাড়া সবাই জানে না সেই জায়গাটি ।

ঘরের চেহারা নেহাতই নিরীহ ।

তবে এই নিরীহ চেহারার ঘরটির সেই কোনও এক লুকনো স্থানে বাড়ির অন্য অনেকেই দামি জিনিস বা টাকাকড়ি রেখে দিতে আসে নিরাপত্তার দরকার হলেই । যার জিনিস সে চুপিচুপি এসে বলে, "এটা এখন আপনার কাছে রেখে দিন ।"

শ্রীভার্গব ধ্যান পুজোর সময় ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে রাখেন এবং বাইরের দিকের জানলা দুটোও ভালমতো করে ছিটকিনি এঁটে বসেন । আবার নাকি 'রক্ষামন্ত্র'ও পড়েন ।

কাজেই ব্যাঙ্কের 'ভল্ট'-এর থেকে কিছু কম সেফ নয় । কারণ ওই ধ্যানজপের অবসরে কখন কোনখানটিতে রাখেন কাকপক্ষীতেও জানতে পারে না । এমনকী, যারা রাখতে দিতে আসে তারাও নয় ।

গতরাত্রে তাই ওই নাতনি খুকুরানির ঠাকুমা বিয়ের পর

যখন বর-কনে বাসরে বসবে, ছেলেমানুষ কনেটা একটু শোবে, তখন তার গায়ে সামান্য কিছু গয়না রেখে, বাকি সব সোনা খুলে নিয়ে বেশ একটি বড়সড় কাশ্মিরি কাজ করা কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে এনে চুপিচুপি বলেছিলেন, "রাতটা আপনার জিম্মায় রেখে দিন বড়দা, কাল সকালে বর-কনে বিদায়ের আগে কনে সাজাবার সময় ওর মা নিয়ে যাবেন ।" শ্রীভার্গব সকলের বড়, তাই যেমন ভাইদের বড়দা, তেমনই ভাইবউদেরও বড়দা ।

কনের ঠাকুমা আসলে মেজো হলেও ইনিই তো বাড়ির গিন্নি । তাঁর কত দিকে কত কাজ । তিনি আবারও বলে গেলেন, "আপনি তো বলেছেন বড়দা, বেলা ন'টার মধ্যেই যাত্রা করতে হবে । ওইটাই শুভ লগ্ন । তো তার আগে নিশ্চয়ই আপনার ধ্যানজপ হয়ে যাবে ।"

শ্রীভার্গব আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ । কাল কি আর বেশি ধ্যানে মন বসবে বউমা ! খুকুরানি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে । ঘর সকালবেলাই খোলা পাবে ।"

হ্যাঁ, নিজের ঘরের আর একটু আধুনিকতা করেছেন শ্রীভার্গব । করেছেন একটি অ্যাটাচড বাথরুম । সেকেলে বাড়িতে যেটি ছিল না ।

তবে ঘরে ঠাকুর আছেন বলে, একেবারে ঘরের লাগোয়া করেননি, দেওয়ালে একটি দরজা ফুটিয়ে সেখানে একটু চাতালমতো বানিয়ে তার সঙ্গে স্নানের ঘর । সবদিক দেওয়াল-তোলা, বাড়ির মধ্যে কোও সংস্রব নেই । বাইরে থেকেও কোনও পথ নেই । নিজের স্নানের ঘরটর নিজেই সাফ করেন তিনি । বলেন, "খুব কম বয়সে একসময় আমি

www.boiRboi.blogspot.com

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে দীক্ষিত ছিলাম রে। গান্ধীজি বলতেন নিজের সব কাজ নিজে করতে হয়। ছোট কাজ বলে ঘেন্না করতে নেই।"

তা আরও পরে কিছুদিন খেতেনও স্বপাকে। অর্থাৎ নিজে রান্না করে।

কিন্তু পরে বয়েস হওয়াতে ভাইবউরা আর ভাইপো-বউটিও মানে ওই বোনের মা খুব অনুরোধ উপরোধ করে সেটা ছাড়িয়েছেন। এখন ওদের রান্নাটান্না খান।

সে-সময় শ্রীভার্গব দোতলায় তিনতলায় ওঠেনও।

বেশ স্নেহশীল মানুষ।

সাধারণ কর্তাদের মতোই। তবে ওই ধ্যানজপ সাধন ভজনের ব্যাপারে অন্যরকম। ইচ্ছেমতন সময় তা সে শেষরাত্রে কি মাঝরাত্রে কে জানে উঠে, স্নান সেরে ধ্যানে বসেন। সকালবেলায় দরজা খোলেন।

তখন বাড়ির সকলে, ছেলেবুড়ো সবাই একবার করে ঠাকুর-প্রণাম করে যায়। আর সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময় সাধ্যমতো প্রায় সকলেই ঘরে এসে জোটে। মস্ত বড় ঘরখানার অনেকটাই তো ফাঁকা থাকে, সেখানে তখন একটি শতরঞ্চি বিছোনো হয়। গতকাল সন্ধ্যাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকী নিমন্ত্রিত মহিলারাও কেউ-কেউ এসে আরতি দেখেছেন, আর 'ওমা! ঠাকুরের কত গয়না' বলে পুলকিত হয়েছেন।

বিয়েবাড়ি বলে মা-কালীকেও সব গয়না পরিয়ে সাজানো হয়েছিল। শ্রীভার্গবই সাজিয়েছিলেন।

সে যাক, সকালে কনের মা কনে সাজানোর সময় বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে বলেন, "দেখে আয় তো-তোদের দাদুর ঘরের দরজা খোলা হয়েছে কি না।"

সে এসে জানায়, না, খোলা হয়নি।

কনের মা তো তখন চঞ্চল হবেনই। আটটা বাজে, এখনও দরজা খোলা হয়নি। অথচ জেঠু নিজেই বলেছেন, বেলা ন'টার মধ্যে যাত্রালগ্ন, অর্থাৎ শুভ সময়। কখন বা গয়নাগুলি নিয়ে আসা হবে, আর কখনই-বা মেয়েকে সাজানো হবে। বাড়ির অন্য বউ-মেয়েরাও ব্যস্ত হচ্ছে, "কই গো, মেয়ের সব গয়নাগুলো কই? কখন বার করে দেবে?"

সাজাচ্ছে তো অনেকে মিলে। কনে মানেই তো জেলখানার আসামি। তাকে নিয়ে যে যা খুশি করে নেয়।

ও বাবা সাড়ে আটটাও যে বেজে গেল।

আবার লোক পাঠানো।

আবার সেই খবর।

দরজা এখনও বন্ধ।

কে একজন বলে, "কাল অনেক রাত পর্যন্ত তো জাগতে হয়েছে, তাই হয়তো বেশি ঘুমিয়ে পড়েছেন। বয়েস হচ্ছে তো।"

তবু কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়?

বরের বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসে গেছে বর-কনেকে নিয়ে যেতে।

চাঁদু বলল, "দোরে টোকা মেরে দেখা হয়েছে?"

"না বাবা ! অত সাহস কার ? ধ্যানে থাকেন যদি । রেগে যাবেন ।"

কে যেন বলে উঠল, "রেগে যাবেন ? আর যাত্রালগ্ন না কী যেন, ওইটা পার হয়ে গেলেও তো 'কেন ডাকা হয়নি !' বলে রেগে যেতে পারেন। একদিন তো মানুষ দৈবাৎ ঘুমিয়ে পড়তেও পারে । বিশেষ করে কাল কে জানে কত রাতে ঘুমিয়েছেন ।"

ওদিকে নতুন বিয়ের বর দেখেশুনে অবাক হচ্ছে, একজন মানুষের ঘুম ভাঙানো নিয়ে এত চিন্তাভাবনা কিসের রে বাবা !

মানুষটি যে মহাসাধক এবং শেষরাত থেকে সাধনা করেন সেটা সে তো তেমন জানে না ।

অবশেষে ব্যস্ততারই জয় হল ।

কনের মা বললেন, "চল খুকু, তুইও নীচে চল । তুই আগে ডাকবি, 'দাদু আমি তোমায় প্রণাম করতে এসেছি ।' তোর ওপর তো আর রাগ করতে পারবেন না ।"

তা সত্যি । এই নাতনিটিই শ্রীভার্গবের সবচেয়ে আদরের । নিজে ওকে সংস্কৃত স্তোত্র, স্তব ইত্যাদি শিখিয়েছেন । এবং ওর বিয়ের জন্য যতরকম ঘটাপটার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন ।

তো সে এসে ডাকল।

সেই মিহিডাকে কোনও কাজ হল না ।

তখন দরজায় টোকা । আগে আস্তে, ক্রমশ জোরে তাতেও কোনও সাড়া নেই ।

ব্যাপার দেখে একে-একে বাড়ির অনেকেই ওই দরজার সামনে এসে জড়ো হয়েছে । অবশেষে একজন সাহস করে দোরে ধাক্কা দেয় । আর দিয়েই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে নেয় ।

নিত্য নিয়মে দরজায় ভেতর থেকে খিল বন্ধ ছিল না । শুধু ভেজানো ছিল । কাজেই ধাক্কা দিতেই দরজাটা দু'হাট হয়ে খুলে গেল । আর যাওয়া মাত্রই অনেক জোড়া চোখের সামনে ঘরের ভেতরকার দৃশ্যটি ঝলসে উঠল ।

সঙ্গে-সঙ্গে অনেক গলার স্বর থেকে আচমকা একটা ভয়ানক আর্তনাদ । তার সঙ্গে বিয়ের কনের গলা চেরা চিৎকার, "ও মা গো ! এ কী গো ! ওরে বাবা রে । আমি মরে যাব রে ।"

টি. সি. পি. এবং এম. কে. ডি. তাদের নীচের দিকে সাইনবোর্ড ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বিয়েবাড়ির আলোর জৌলুস আর লোকজনের আনাগোনা দেখেছে । এমনকী, বাসরে গান হচ্ছে তাও কানে এসেছে ।

টি. সি. পি. দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মাঝে-মাঝে একটু ঘ্রাণ টেনে বলেছে, "ইস ! কী মার্ভেলাস ফ্রাই ভাজার গন্ধ আসছে রে এম. কে. ! বাড়ির এত কাছে বিয়েবাড়িতে একটা নেমন্তন্ন জুটল না রে !"

ওদের ভাগ্যে যে জুটতে জুটতে জোটেনি, তা তো আর জানা নেই ওদের ।

"এই এত ফ্ল্যাটের সবাইকে নেমন্তন্ন করবে । তা হলে কনের বাবাকে দেউলে মেরে যেতে হবে ।"

www.BanglaBook.org

"আহা, বাবা কেন ? শুনলি তো কনে ওই টাকাওলা বুড়োর নাতনি । তা ছাড়া সব ফ্ল্যাটেই করতে যাবে কেন ? আমরা একেবারে সামনাসামনি । দেখছিস তো যতবার জানলার পরদাগুলো ওড়াউড়ি করছে, ভেতরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি । কত গয়না পরেছে রে মহিলারা ।"

"বাঃ বিয়েবাড়িতে গয়না পরবে না ?"

বলে মদন বকে বলেছে, "চল চল, ঘরে চল । আর বিয়েবাড়ি দেখতে হবে না ।"

শুতে চলে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে ।

সকালে আবার বারান্দায় বেরিয়ে গলা ঝুঁকিয়ে দেখছে চায়ের দোকানের ছেলেটা আসছে কি না, হঠাৎ গত রাত্তিরের ওই জোর উৎসবে ভাসা বাড়িটার মধ্যে থেকে ভয়ানক একটা শোরগোলের সঙ্গে আর্তনাদ উঠল । তার সঙ্গে একটা নারীকণ্ঠের আকাশচেরা কান্নার স্বর ।

বাড়িটার গা ঘিরে এখনও রঙিন টুনি বাল্‌বগুলো জ্বলছে । তবে সকালের আলোয় জেল্লা নেই, যেন মরা-মরা ।

"কী ব্যাপার রে মদনা ?"

ফস করে আসল নামটা বলেই ফেলে ট্যাঁপা !

মদন চিন্তিতভাবে বলল, "কী জানি বাবা !"

"বিয়েবাড়িতে বেঁচে যাওয়া ফ্রাই আর চপটপগুলো বেড়ালে-কুকুরে খেয়ে যায়নি তো ?"

"আঃ, মারব এক থাপ্পড় ট্যাঁপা । তুই আর কারণ খুঁজে পেলি না ? এ তো মনে হচ্ছে মড়াকান্না ? হঠাৎ কারও

কিছু ঘটে গেল নাকি ?"

ট্যাঁপা মাথা চুলকে বলে, "হতেও পারে । হয়তো দেদার সাঁটিয়েছিল ।"

"ট্যাঁপা তুই থামবি ?"

"আচ্ছা বাবা থামছি । কিন্তু আমাদের কি একবার নীচে নেমে গিয়ে খোঁজ করা উচিত নয় ?"

"দূর ! আমরা কে ? যদি বলে তোমাদের অত খোঁজে দরকার কী ? কই, এত ফ্ল্যাটের কেউ নেমেছে বলে তো মনে হচ্ছে না ।"

কথাটা সত্যি । কেউ নামেনি রাস্তায় । তো সত্যি হবে না তো কী হবে ? আজকাল কি আর কেউ সেই আগেকার দিনের লোকের মতো আত্মীয়স্বজন বা পাড়া-পড়শির বিপদ দেখলে হইচই করে ছুটে আসে ? সেসব আগে আসত ! পাড়ায় হঠাৎ কারও বাড়িতে মাঝরাত্তির শেষরাত্তির যখনই হোক 'চোর চোর' রব শুনলে পাড়াসুদ্ধু সবাই যে যা পারত হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত । লাঠিসোঁটা, দরজায় লাগাবার লোহার খিল, কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি, মসলাবাটা শিলের নোড়া, এমনকী হামানদিস্তের ডাঁটিটা, ডাবকাটা কাটারিও, যা হাতের কাছে পেত ।

আবার কারও বাড়িতে ওইরকম কান্নাকাটির রোল উঠলেও আপন-আপন কাজ ফেলে ছুটে এসে জানতে চাইত, "কী হয়েছে ?"

হঠাৎ কারও শক্ত অসুখ করে গেছে ?

পাড়ার লোকই ছুটবে ডাক্তার ডাকতে, ওষুধ এনে

দিতে । হঠাৎ কেউ পড়ে গিয়ে হাত-পা-মাথা ভেঙে বসলে ? ওই পাড়ার লোকেরাই ছুটোছুটি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে । আর কারও বাড়ির কেউ মারা গেলে ? সেও পাড়ার লোকেরাই এগিয়ে আসবে খাট কিনে আনতে, শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যেতে । কারণ অন্যের মনের অবস্থা বুঝে সহানুভূতি আসত তখন লোকের । আর ভাবত, যাদের বাড়িতে বিপদ, তারা তো দুঃখে-শোকে কি ভয়-ভাবনায় দিশেহারা হবে । তাদের তখন ছুটোছুটি করে কাজ করবার শক্তি থাকবে কী করে ?

তা এইসব ভাবনা থেকেই সেকালে লোকে পরের বাড়ি থেকে একটু টুঁ শব্দ উঠলেও, সচেতন হত ।

হবে না ? তখন তো পাঠ্য পুস্তকেও এইরকম কবিতা থাকত, 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী'পরে । সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।'

এখন আর ওসব পরটর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না । কে বাবা হাঙ্গামার মধ্যে মাথা গলাতে যাবে !

তা ছাড়া—ওই 'পরেরা'ও হয়তো নিজেদের ব্যাপারে অন্যের মাথা গলানো পছন্দ করে না ।

তা নইলে ওই গোলমাল ওঠা বাড়িটা কিনা ঝপ করে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোবার তিন-তিনটে দরজাই ভেতর থেকে সেঁটে বন্ধ করে দেয় ?

চায়ের দোকানের ছেলেটা তো বলল, ভেতর দিকে তালাই লাগিয়ে দিয়েছে । তার মানে যদি কেউ ভুলে দরজা খুলে দেয়, আর বাইরের লোকেরা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে !

তাই সাবধান হওয়া ।

হ্যাঁ, ছেলেটা চা নিয়ে এসে দাঁড়াতেই এরা বলে উঠেছিল, "সামনের ওই ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে হঠাৎ কী হল রে ? কাল অত ঘটাপটা । আর আজ সকালে ..."

ছেলেটা কেটলিটা নামিয়ে রেখে দুটো হাত ওলটাল ।

"বাঃ ওদের বাড়ির ওই একটা কাজের ছেলের সঙ্গে তো তোর খুব দোস্তি দেখি । রোজ ওকে ভাঁড়ে করে চা দিয়ে যাস । আজ দিসনি ?"

"ও বেইরে এলে তো ! জানলা দে ইশারা করল, বেরোতে পারবে না ।"

ট্যাঁপা একটু কাতরভাবে বলল, "মনে হচ্ছে যেন কান্নাকাটির শব্দ উঠল একবার । এখন তো চুপ মেরে গেছে ।"

তা সত্যি । ওই জোর আওয়াজের পরই হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ।

ছেলেটা চা-টা দুটো পেয়ালায় ঢেলে খালি কেটলিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বেশ বিজ্ঞের মতো বলল, "কনে মেয়েটা বোধ হয় শোউরবাড়ি যেতে হবে বলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল । আমাদের গেরামে দেখিচি তো ! শুদু কনেটা কেন, বে'র পরদিন সকালে বাড়িশুদ্ধ সবাই ডুকরে-ডুকরে কাঁদে, বর-কনে বিদেয়ের আগে ।"

কিন্তু দাদুর ঘরের দরজাটা দু'হাট হতেই বিয়ের কনে খুকুরানিকে, ভাল নাম যার কমলিকা, এমন কী দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে, সে অমন আকাশচেরা আর্তনাদ

করে উঠেছিল ?

তা সে দৃশ্যটি ভয়ঙ্কর ভয়াবহ বইকী । একবার মাত্র দেখেই তো চোখ বুজে ফেলেছিল সে । তবু এখনও দোতলায় খাটের ওপর সেই বোজা চোখেই উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেও যেন সেই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে, তাই কেঁপে-কেঁপে উঠছে, আর কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাচ্ছে ।

তাকে তো সবাই মিলে ধরে টেনে এনে এই দোতলার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, আর কে একজন তার পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে । পাখাটাও খুলে দিয়েছে ফুল ফোর্সে ।

এখন নীচের তলার ঘরে সেই দৃশ্যের সামনে হতভম্ব জটলা । তাদের মধ্যে থেকে চাঁদু হঠাৎ চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, "পুলিশ, পুলিশ, পুলিশে খবর দেওয়া হোক ।"

ঠিক এই সময় বিয়ের বরটিও ওই ভিড় ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে দৃশ্যটি অবলোকন করে বলে উঠল, "তার আগে একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া বেশি জরুরি ।"

"ডাক্তার ! তাই তো । 'ডাক্তার' বলে একটা শব্দ আছে বটে । কিন্তু ডাক্তার এসে কিছু করবার অবস্থা কী আছে, আর ?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে না ।"

দৃশ্যটি হচ্ছে এই—গতকাল সন্ধ্যায় 'সর্বালঙ্কার ভূষিতা যে কালীমূর্তিটি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে থেকে শতজনের প্রণাম নিচ্ছিলেন, তিনি বেদি থেকে হুমড়ে গড়িয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন, আর তাঁরই সামনাসামনি দু'হাত মাথার দিকে ছড়িয়ে হুমড়ে সপাটে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন দাদু অর্থাৎ—জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিঃ শিরোমণি জ্যোতিঃশাস্ত্রী শ্রীভার্গব আচার্য ।

তবে এখনও 'শ্রী' আছেন, না চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছেন, দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর বিছিয়ে থাকা একখানা হাতের মুঠোর মধ্যে ঠাকুরের গলার জবার মালার খানিকটা টুকরো আর কয়েকটা টুকরো কাছেই ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে। ভার্গবাচার্যের উপুড় হওয়া মাথার একটা ধার থেকে রক্ত গড়িয়ে গাল আর কান বেয়ে মাটিতে খানিকটা পড়ে জমাট হয়ে রয়েছে। আর গা থেকে এলিয়ে পড়া ধবধবে পৈতেটার খানিকটা পাঁজরের কাছে ঝুলে পড়ে রক্তমাখা হয়ে মাটিতে লেপটে রয়েছে।

বিয়ের বরের ওই জোর গলার কথায় কে যেন আস্তে বলে উঠল, "ডাক্তার!"

"হ্যাঁ। সব আগে ডাক্তার ডাকুন তো। কাছেই পাড়ার মধ্যে আপনাদের কোনও ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান নেই?"

এখন কনের বাবা কাতরভাবে বলে ওঠেন, "আছেন তো! থাকেন তো এই কাছেই। কালই তো বাড়িশুদ্ধ সবাই নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন। কিন্তু বলে গেছেন আজ খুব ভোরের ট্রেন ধরে কোথায় যেন যেতে হবে কোন আত্মীয় বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে।"

"চমৎকার। ডাক্তার হয়ে এবেলা-ওবেলা নেমন্তন্ন।" বর এইটুকু বলে দৃশ্যের খুব নিকটে এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, "সরুন। আমাকেই একটু দেখতে দিন।"

চাঁদু বলে ওঠে, "কিন্তু আসার আগে ডেডবডি টাচ করাটা কি ঠিক হবে?"

"ডেডবডি! ডাক্তার না হয়েই ডিসিশানে এসে

গেছেন? যাক তা হলেও ঠিক হবে।"

বলে নতুন বর একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, "আপনাদের বোধ হয় খেয়াল নেই, আপনারা একটা ডাক্তারকে জামাই করে এনেছেন।"

সবাই থতমত।

অ্যাঁ। তাই তো। নতুন জামাই যে খুব ভালভাবে পাশ করা একটি ডাক্তার। সত্যিই তো খেয়াল ছিল না পরনে কুঁচকে মুচড়ে যাওয়া সিল্কের পাঞ্জাবি, জরিপাড় বেনারসির জোড়, কপালে এখনও শুকনো চন্দনের দাগ। কাল থেকে, বাড়ির প্রথম নাতজামাই হিসাবে তাকে নিয়ে প্রায় ডাঙ্গুলি খেলা হচ্ছে, তার মধ্যে কার আবার মনে পড়েছে—সে ডাক্তার!

সেই ডাক্তার নাতজামাই 'নিহতর' কবজিটা একটু ধরে থেকেই ঝট করে বলে ওঠে, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।"

হসপিটাল। তার মানে প্রাণটা আছে এখনও? একেবারে নিহত হয়ে যাননি। ওঃ ভগবান।

জামাইয়ের নাম গৌরব মুখার্জি।

তার নতুন কনের মনে হল, নামটা সার্থক। সবাই তো ধরেই নিয়েছিল ওই মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়া সপাটে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহখানা স্রেফ ডেডবডি। ওই লোকটা না তাকে শ্মশানে চালান দেওয়ার বদলে হাসপাতালে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

ব্যবস্থাটি খুব তাড়াতাড়ি করা হয়, নতুন জামাই

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যায়ও এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যাপারে খুব সাহায্যে লাগে। ওখানকার ছাত্র তো!

মেজোকর্তা মানে কনের আসল ঠাকুর্দা বলেন, "বড়দা যখন জীবিতই রয়েছেন, তখন আর এক্ষুনি পুলিশে খবর দিয়ে দরকার নেই। দেখা যাক এটা অ্যাক্সিডেন্ট না চোর-ডাকাতের কাজ। এমনও তো হতে পারে, বেশি রাতে শোবার আগে ঠাকুরের পায়ের কাছে জড়ো করা একগাদা ফুল-বেলপাতা জবার মালাটালা সরিয়ে সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ টাল খেয়ে পড়েছিলেন ঠাকুর, আর পড়েছিলেন, ভক্ত বেচারিরই ঘাড়ের উপর। তা থেকেই এই কাণ্ডটি ঘটে গেছে। হলেও মা-কালী মাত্র ফুট আড়াই লম্বা, কিন্তু 'অষ্টধাতু'তে তৈরি তো। ভীষণ ভারী হয় ও জিনিসটি।

শ্রীভার্গবের (এখনও পর্যন্ত তো শ্রী'ই রয়েছেন) হাতের মুঠোয় জবার মালার টুকরোটুকুও এই অনুমানের একটি প্রমাণ! ওঁকে হাসপাতালে পাঠানোর পর ওঁর মেজো ভাই অর্থাৎ কনের আসল ঠাকুর্দা বলেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ওটাই সম্ভব।"

অতঃপর চারদিক থেকে প্রশ্ন, "তাই যদি হয়, তবে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না কেন? আর ঠাকুরের এমন ন্যাড়া-বোঁচা মূর্তিই বা কেন? গায়ের অতসব গয়না গেল কোথায়?"

"দরজা? দৈবাৎ বন্ধ করতে ভুলে যেতে পারেন। কালকে রাতটা তো অন্যরকম ছিল। আর গয়না? সে তো উনি রাত্রে খুলেটুলে রাখেন।"

"রাখেন কিছু-কিছু। তা বলে নথ কঙ্কন মুকুট গলার একগাছিও অন্তত মালা এবং পায়ের কোনও একটা গয়না এসব থাকবে না? কখনওই নয়। এগুলো থাকেই। এ যে একেবারে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া মূর্তি।"

তা ছাড়া খুলে রাখলেও রাখবেন তো কোথাও? কোথায় সেই বাক্স কি সিন্দুক? ঘরের দরজা বন্ধ করে তবে রাখতেন। লুকনো জায়গা!"

"কিন্তু বাড়ির কেউ জানে না সে জায়গা?"

"মনে হয় জানে দু-একজন।"

কিন্তু সেই 'দু-একজন' যে কে সে-খবর বাড়ির অপর কারও জানা নেই। যাঁর জানা, তিনি তো এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একটি বেডে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়। সে চৈতন্য আর ফিরবে কি না বলা যাচ্ছে না। ডাক্তারেরা এখন অভিমত দিতে রাজি নয়। মাথার আঘাত বলে কথা!

তা হলে?

কী করে জানা যাবে ঠাকুরের গয়নাপত্র শ্রীভার্গব খুলে তুলে রেখে অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়েছেন, নাকি কাজটা কোনও চোর দুর্বৃত্তর?

সকলেরই ইচ্ছে ঘরখানা বেদম তল্লাশ করে দেখি একবার, কোথায় সেই রহস্যক্ষেত্র? শুধু ঠাকুরের গয়নাই তো নয়, নতুন কনের একরাশ গয়নাও তো ওঁর জিম্মায় রেখে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু এখন ঘরের কোনও জিনিসে হাত ঠেকানো চলবে

না । কর্তাদের কড়া বারণ । কে বলতে পারে শেষ অবধি পুলিশ ডাকতে হবে কি না ! শ্রীভার্গবের যদি জ্ঞান-চেতনা না ফেরে ? তা হলে তো তাঁকে নিহত বলেই গণ্য করতে হবে ! শেষগতি তো তা হলে সেই পুলিশ !

বাড়ির ছোটকর্তা অর্থাৎ শ্রীভার্গবের ছোট ভাই শ্রীভৈরবও মা-কালীর ভক্ত । কালীঠাকুরের গান, মানে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে পারেন ভাল । শ্রীভার্গবের দৈবাৎ কোনওদিন একটু শরীর খারাপ-টারাপ হলে পুজো-আরতি চালিয়ে দেন । যদিও সেটা দৈবাৎই । এই বয়েসেও শ্রীভার্গবের শরীর রীতিমত মজবুত । তো সে যাক, ছোটকর্তা তো এখন মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে পড়ে আছেন, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খবর নিচ্ছেন পেশেন্টের অবস্থা কী । আর বাইরে বেরিয়ে এসে 'পাবলিক টেলিফোন' থেকে খবরটা বাড়িতে জানাচ্ছেন ।

তা প্রাণে যখন বেঁচে রয়েছেন, তখন আবার আস্তে-আস্তে বাড়িতে কাজকর্মের সাড়া পড়েছে একটু-একটু । ডেকরেটারের লোকেরা প্যাণ্ডেল খুলে বাঁশের পাহাড় জড়ো করে-করে ঠেলায় চাপাচ্ছে, সারা বাড়িতে বিছানো টুনি বাল্বগুলো খুলে নিচ্ছে, বর বসাবার জন্যে যে মখমল মোড়া সিংহাসনতুল্য চেয়ার আর বালিশ, কার্পেট, ফুলদানি ইত্যাদি সাপ্লাই করেছিল, সেসব নিয়ে যাচ্ছে ।

ওদিকে বাড়ির মধ্যে নাওয়া-খাওয়াও চলছে ।

গতরাতে বেঁচে যাওয়া চপ ফ্রাই আবার ভেজে নিয়ে তাজা করে বিষণ্ণ-বিষণ্ণ মনে কামড় দেওয়া চলছে । মাছের কালিয়া আর মালাইকারির গামলা উনুনে বসিয়ে ফোটানো

হচ্ছে । ভাতও চেপেছে । এবং আস্তে-আস্তে বর-কনে বিদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । বর গৌরব মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফোনে জানিয়েছে, "এখনই যাচ্ছি । আপনারা প্রস্তুত হোন ।"

তাদের বাড়িতেও তো দারুণ বিশৃঙ্খলা চলছে । বাড়িভর্তি লোকজন । রান্নাবান্নার ঢালাও কারবার, অথচ আসল লোকেরাই এসে পৌঁছল না । তারাও ঘন ঘন খবর নিচ্ছে । পরম ভাগ্য যে, কনের জ্যাঠদাদু মহাসাধক মহাজ্যোতিষার্ণব শ্রীভার্গব খুন হয়ে ডেড্‌বডি হয়ে যাননি । অন্তত এখনও পর্যন্ত তো যাননি । কাজেই বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানগুলো তো সেরে নিতেই হবে । হাসপাতাল থেকে কখন কী খবর আসে কে জানে বাবা ! বিপদ তো মাথার ওপর ঝুলছে ।

এদিকে এখানেও মহাবিপদ ।

সেই কনে সাজানোর গয়না । প্রস্তুত হওয়া মানেই তো কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখা । কনের ঠাকুমা এখন মনে মনে মাথা চাপড়াচ্ছেন, 'কেন মরতে আমি গয়নার বাক্সটা বড়দার জিম্মায় রাখতে গেছলাম ছাই । নিজের ঘরের আলমারিতে রেখে দিলে তো এমন বিপদে পড়তে হত না !'

আসলে মেজোগিন্নিটি জানেন ঠাকুরের গয়না, বাড়ির দামি জিনিস কি টাকাকড়ি কোথায় রাখেন বড়দা । কারণ তাঁকে শ্রীভার্গব খুব স্নেহ করেন এবং অতিশয় বিশ্বাস করেন । কিন্তু সে-কথা তো আর কারও জানা নেই । এখন বলেই বা ফল কী ? ঘরের দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে ছোটকর্তা সে চাবি নিয়ে বড়দার সঙ্গে হাসপাতালে

চলে গেছেন । কাজেই চুপি-চুপি একবার গিয়ে যে দেখে আসবেন, সেসব আছে না নেই, তার উপায় নেই । ছোটকর্তা একটু দুঁদে প্যাটার্নের । তাঁকে সবাই ভয় করে ।

বাড়িতে আর-একজনও জানে শ্রীভার্গবের সেই গুপ্ত সিন্দুকের অবস্থান রহস্য । কিন্তু সেই বা বলে উঠবে কী করে ? সে যে আবার তেনার কাছে সত্যবদ্ধ 'কাউকে বলব না' বলে ।

গৌরব-ডাক্তার ফিরল । শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে স্নান করে আবার সেই কোঁচকানো মোচড়ানো সিল্কের পাঞ্জাবি আর বেনারসির জোড় গায়ে চড়ানো, এবং গতকাল থেকে যে ফুল-সাজানো মোটরগাড়িটা বাড়ির বাইরে দাঁড় করানো আছে, তার ড্রাইভার উপস্থিত আছে কি না খোঁজ নিল । পাকেচক্রে, নতুন জামাই একবেলাতেই পুরনো বনে গেছে । তা ছাড়া যেন এদের আধডুবো নৌকোটায় হাল ধরে বসেছে । ডাক্তারদের আলাদা একটা দায়িত্ববোধ থাকেই ।

তার মুখে জানা গেল আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে ক্রাইসিস কাটবে না । বলল, "আমাদের বাড়িতেও তো সকলে খুব অসুবিধেয় পড়ে গেছেন, আপনাদের মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছে দিয়েই আবার আমি খোঁজ নিতে মেডিক্যাল কলেজে যাব ! এখন চটপট তাকে গাড়িতে চাপিয়ে দিন । এই ঢাকুরিয়া থেকে হাতিবাগানের মোড়, কম সময় তো লাগবে না !"

বাড়ির লোকেরা তখন বুদ্ধি করে কনের খুড়ি-পিসি মা-মাসিদের গয়না থেকে বেছেগুছে ভালমতো কিছু নিয়ে কনে সাজিয়ে গাড়িতে তুলে দেয় । শাঁখও বাজে । উলুও পড়ে ।

তার মধ্যে কান্নাকাটিও চলে ! বর-কনেকে গাড়িতে তোলার সময় তো বটেই, গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পরও মহিলারা সব চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কেঁদে, চোখ মুছতে-মুছতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান । তার মানে চা-ওলাদের সেই ছেলেটা নেহাত মিথ্যে বলেনি । মেয়ের বিয়ের পরদিন সকালে বেশ একখানা কান্নাকাটি পড়ে ।

তবে এদের ব্যাপারে আরও একটু বেশি যোগ হয়েছে । বাড়ির হেড আসল রোজগারি মানুষ আর সকলের ভক্তিশ্রদ্ধার ভালবাসার বড়দা বেঁচে আবার বাড়ি ফিরবেন কি না ! গয়নাপত্তরগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে কি না ! যেসব মাসি-পিসি খুড়ি-জেঠি নিজেদের সব গয়নাটয়না দিয়ে খুকুরানিকে সাজিয়ে পাঠালেন, সেসব আবার ওদের বিয়েবাড়িতে পাওয়া যাবে কি না । এবং সকলের ওপর দুশ্চিন্তা মা-কালীর মূর্তিটি অমনভাবে বেদি থেকে মাটিতে হুমড়ে পড়ে যাওয়ার ফলে বাড়িতে আর কোনও ভয়ানক অমঙ্গল হবে কি না ।

আজ তো সকাল থেকে ঠাকুরের পুজোই হল না । এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি । ছোটকর্তা শুধু তাঁকে মাটি থেকে তুলে বেদিতে দাঁড় করিয়ে দোরে তালাচাবি লাগিয়ে চলে গেছেন । কে কী করে পুজো করবে ?

ট্যাঁপা আর মদনা তাদের 'টি. সি. পাল, আর এম. কে. দাস' নাম মার্কা ঝোলানো সাইনবোর্ডটার মাথার দিকে বারান্দায় বুক ঝুলিয়ে সকাল থেকে সব অবলোকন করে চলেছে ।

একসময় হঠাৎ বাড়ির সদরটদর খোলা হল, আর তারপর বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেখেই বলে উঠেছে, "যাক বাবা, বোধ হয় কেউ পড়ে হাড়গোড় ভেঙেছে, খুনটুনের ব্যাপার নয় ।"

কিন্তু কীরকম লোককে স্ট্রেচারে চাপিয়ে গাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, তা দেখতে পাওয়া গেল না । গাড়িখানাই আড়াল করে বাদ সাধল । তবে বিয়ের বরটা নয়, কী ভাগ্যি । তাকে তো দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে তদ্বির করতে । দেখেই বোঝা গেল তো । এখনও কপালে চন্দনের শুকনো রেখা । হাতের কবজিতে কী সব সুতোটুতো বাঁধা ।

ট্যাঁপা বলল, "নতুন বরটা তো খুব সর্দার রে মদনা । ওর বউটা হাত-পা ভাঙেনি তো ?"

মদনা বলল, "দুর । দেখলি না গাড়ি থেকে স্ট্রেচার বে'র করার সময় ? দিব্যি লম্বাচওড়া একখানা লাশ ।"

"আঃ ! ওই ভাইপোটার কিছু হলে তো মন্দ হত না ! ওটা একটা পাজি ! তো ওটা যে দেখছি দিব্যি ঘোরাফেরা করছে ।"

মদনা বলে ওঠে, "তোর এই হিংসুটে স্বভাবটা কী করে যাবে রে ট্যাঁপা ? ওকে তুই দেখতে পারিস না বলে-"

"বলেই তো দিয়েছি স্বভাব যাওয়ার নয় । কিন্তু ঠাকুরমশাইকে দেখছি না কেন বল তো ? বরটাও ওই অ্যাম্বুলেন্সে চেপে বসল মনে হল । অথচ ঠাকুরমশাই ... "

"তিনি বোধ হয় ধ্যান জপ নিয়ে বসে আছেন ।"

তার খানিক পরই ট্যাঁপা নাক টেনে বলে, "আরেব্ বাস । মদনা রে । আবার যে ফ্রাই ভাজার সুবাস ছাড়ছে রে ! আজ আবার কী ?"

"কালকেরগুলো আবার ফ্রেশ করে নিচ্ছে বোধ হয় ।"

"তা হলে মারাত্মক কিছু ঘটেনি বোধ হয়, কী বলিস মদনা ?"

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, "ও থেকে কিছু প্রমাণ হয় না । বাড়িতে কেউ মারা না গেলেই লোকে খাওয়া-দাওয়াটি চালিয়ে যাবে !"

একসময় দু'জনে যথা নিয়মে রাস্তায় নেমে 'সুস্বাস্থ্য ভোজনালয়'-এ গিয়ে খেয়ে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে-টুরে ফেরার পথে দেখল, কালকের বাসী হয়ে যাওয়া ন্যাতানো ফুলের মালায় সাজানো মস্ত গাড়িখানায় বরকনেকে ওঠানো হয়েছে, আর সমবেত ক্রন্দন চলছে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দে ।

"আরে শাবাশ ! চা-ওলা ছেলেটা তো ঠিক বলেছিল, মদনা ।"

মদনা বলে, "ভুলই বা বলতে যাবে কেন শুধু-শুধু ? ও আমাদের থেকেও বেশি দেখেছে ।"

ট্যাঁপা গভীর দুঃখের গলায় বলে, "সত্যি রে মদনা, আমরা কতটুকুই বা জানি ? ভাবছি হাত গোনাটা শিখে নিতে পারলে মন্দ হয় না ।"

"ওই ঠাকুরমশাইটিকে ধরাধরি করে ধরনা দিয়ে পড়ে বলব, বিদ্যেটা আমাদের শিখিয়ে দাও বাবা !"

"অত সোজা ?"

"আহা, শক্ত ভাবলে শক্ত, সোজা ভাবলে সোজা। শেখায় মন চাই। এই যে আমাদের টিকটিকি-বিদ্যেটা শেখা তো হয়েছে কিছু ?"

"সে তো মগজ খাটানোর ব্যাপার !"

ট্যাঁপা অবলীলায় বলে, "তোর মধ্যে যতটা মগজ আছে, আমার তো তা নেই রে মদনা, আমি এটা শিখে ফেলতে পারলে আখেরে টিকটিকিগিরিতেও সুবিধে হবে। ধর, একটা খুন হল। দেখতে গিয়ে হাত গুনে বুঝে ফেললুম খুনিটা কেমন দেখতে, কী তার আচার-আচরণ।"

"আচ্ছা ট্যাঁপা, তোর মাথায় সকলের আগে খুনটাই বা চাপে কেন বল তো ? রহস্যময় চুরি-ডাকাতির কেস হলেও তো হয়।"

ট্যাঁপা বিব্রত গলায় বলে, "তাও অবশ্য হয়। কিন্তু সেসব কেসই বা পাচ্ছি কোথায় ? কতদিন হয়ে গেল, বসে-বসে শুধু ভ্যারেণ্ডা ভেজে চলেছি।"

মদনা নিশ্বাস ফেলে বলে, "তা সত্যি ! কপালটা আবার বন্ধ হয়ে গেল দেখছি।"

তা কে জানত, দু'দিনের মধ্যেই ওদের দীর্ঘনিশ্বাসের ফল ফলবে। কপালটা আবার খুলে যাবে।

আর খুলবে একেবারে নাকের ডগা থেকেই।

নতুন জামাই গৌরব ডাক্তারই এখন যেন এ-বাড়ির কর্ণধার হয়ে বসেছে। যদিও বড়দাদুর ক্রাইসিসটা সম্পূর্ণ কাটেনি, তবু সে আশা দিচ্ছে। তা ছাড়াও চাঁদু যত

পুলিশ-পুলিশ করে তড়পাচ্ছে, ততই সে বলছে, পুলিশের নাম ছাড়ুন তো। জটিলতা বাড়া ছাড়া আর কিছু হবে না। এসব ব্যাপারে প্রাইভেট ডিকেটিভই হচ্ছে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

হ্যাঁ, ব্যাপারটি বোঝা হয়ে গেছে বইকী !

দাদুর জন্য কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে কমলিকা তার নতুন বিয়ের বরের কাছেই বলে ফেলেছিল, "বড়দাদুর কাছে একদিন খুব আবদার করছিলাম, ও দাদু, দেখাও না কোথায় রাখো ঠাকুরের গয়নাটয়না ? তো দাদু বলেছিল, কাউকে বলে ফেলবি না তো। আমি বলে বসেছিলাম, সত্যি বলছি, কাউকে বলব না। তো আমায় যদি নিয়ে গিয়ে ঘর বন্ধ করে দেখতে দাও, তা হলে দেখি, সেসব আছে না চোরে দাদুকে মেরেধরে নিয়ে গেছে।"

সেই কথামতো আনা হয়েছিল তাকে।

কিন্তু একা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। মনে হল ন্যাড়াবোঁচা মা-কালী যেন তাঁর মস্ত-মস্ত রূপোর চোখ তিনটে দিয়ে কটমট করে তাকিয়ে দেখছেন। কী ভাগ্যিস, রূপোর চোখ তিনটে খোয়া যায়নি। সোনার জিভটিকে তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে সেটি একটি ঢাকনি মতো। আলগা করে সামনে পরিয়ে দেওয়া হয়, ঠাকুরের সাজাগোজার দিন খুলে পড়ে ফুল বেলপাতার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সোনার নামভুক্ত জিভটি তো আছে রক্তমাখা রঙের। আর ওই ত্রিনয়ন ! ওরে বাবা !

খুকুরানি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের খিল খুলে বেরিয়ে

এসে বলে,"ঠাকুমা, পারব না । বাবা ! আমার ভীষণ ভয় করছে ।"

তখন ঠাকুমা চুপিচুপি বলেন, "আমিও জানি । তোর ছোট ঠাকুর্দাকে বল আমার কাছে একবার চাবিটা দিয়ে রাখতে ।"

শুনে শ্রীভৈরব তো রেগেই আগুন । "তুমিও জানতে ? তা হলে হয়তো বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে বলে বেড়িয়েছ । মেয়েদের পেটে কথা থাকে না ।"

বউদিটির সঙ্গে প্রায় একই বয়েস, তাই এমন কথা বলে বসতে পারেন ।

মেজোগিন্নি বলেন, "কী যে কথা । অমনই বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে বলে বেড়িয়েছি ? কচিকাঁচা নাকি ? বলি ওই বাচ্চাটাও তো বলেনি । বড়দা আমায় বিশ্বাস করে বলেছিলেন, আমি ছাড়া আর একজনেরও জানা দরকার, বুঝলে বউমা মানুষের শরীর ! কখন কেমন থাকে । তবে দেখেছি মাত্র । হাত দিইনি কোন দিনও । দাও দিকি চাবিটা । দেখি কী অবস্থা ।"

ছোটকর্তা আর কী করেন ! অগত্যাই অনিচ্ছের সঙ্গে চাবি দুটো খুলে দেন নিজের পৈতে থেকে । সেদিন থেকে তো নিজের পৈতেতেই বেঁধে রেখেছেন ডবল তালার দুটো চাবি । যেমন রাখতেন বড়কর্তা !

মেজোগিন্নি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল লাগান । জানালা-টানালা তো সেদিন থেকে বন্ধই আছে ।

বন্ধ দরজার বাইরে বাড়ির প্রায় সকলেই ।

কী হয় । কী হয় । আবার কী দৃশ্য দেখেন

মেজোগিন্নি !

কিন্তু তারপর ?

খুব বেশিক্ষণ কী অপেক্ষা করতে হয় কাউকে ?

না । একটু পরেই ঘরের খিল খুলে কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে বেরিয়ে আসেন ।

নেই নেই ! কিছু নেই !

ঠাকুরের গয়নার লেশমাত্রও নেই, নগদ টাকাকড়ি যে একটা থলিতে থাকত বড়দার, তাও নেই, আর নেই সেই কাশ্মিরি কাজকরা কাঠের বাক্সটা । খুকুরানির বিয়ের সমস্ত গহনা ।...হ্যাঁ, শুধু এক কোণে পড়ে রয়েছে মা-কালীর সেই সোনার জিভ । ব্যস, সে আর কতটুকু সোনা ?

সন্দেহ তো ছিলই, তবু নিশ্চিত হয়ে যেতেই, বাড়িতে আর একবার শোকের ঢেউ আছড়ে পড়ল । শ্রীভার্গবের তো তবু এখনও 'ক্রাইসিস' চলছে, যেতেও পারেন, বেঁচে ফিরতেও পারেন । কিন্তু এর আর ফেরবার আশা আছে এমন মনে করা যায় না । জন্মের শোধই গেছে ।

ছোটকর্তা গম্ভীর গোবদা মুখ করে বললেন, "আবার চাবি ফেরত দিতে এসেছ কেন ? আর কিসের জন্য সাবধান ? তো জানা কথাই ! মেজদা যে কেন কেবলই সমানে অ্যাকসিডেন্ট বলে চালাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তা বুঝতে পারছিলাম না ।"

বলে মেজদা মেজোবউদির দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চাবি দুটো মাটিতে আছড়ে ফেলে চলে যান ।

এখন সকলেই সেই লুকনো জায়গাটি দেখতে ঘরের

মধ্যে ঢুকে আসে । এখন আর দেখতেই বা বাধা কী, বলতেই বা বাধা কী । সে জায়গাটি হচ্ছে মা-কালীর ওই বেদিটিই । তিনদিকে দেওয়াল বানিয়ে ওপরে শতদলপদ্ম বসিয়ে তৈরি হয়েছে দিব্যি একখানি ছোট্ট ঘরের মতো । অথবা সিন্দুকের মতোও বলতে পারা যায় । পেছনটিতে আপাতদৃষ্টিতে দেখতে সিমেন্টের দেওয়ালই, কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা সেলেট পাথরের স্ল্যাব । যাকে ঠেলে সরানো যায় । ঠাকুরের একেবারে পেছন দেওয়ালে যে লাল শালুর বাহারি পরদাটি দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা, তার আড়ালেও কৌশল ! আসলে সেটা একটা ফাঁকা খিলেন মতো । পরদা সরিয়ে তার মধ্যে একটু ঢুকে বসে ঠাকুরের পিছনের গুপ্ত সিন্দুকটি খোলা-বন্ধ করা হয় ।

বাইরে থেকে দ্যাখো দেওয়ালের গায়ে ল্যাপটানো—বেশ একটু উঁচু বেদি, তার উপর শতদলপদ্মের ওপর শায়িত মহাদেবের ওপর মা-কালী দাঁড়িয়ে । শালুর চালচিত্রটি বাহার মাত্র ।

এখন তো সকলেই দেখে ফেলেছে, আর গালে হাত দিচ্ছে । ও বাবা । ওইটুকুর মধ্যে এত কৌশল । জেঠুর মাথাটি ধারালো বটে । দাসদাসীরাও দেখছে আর বলাবলি করছে, "তা ঠাকুর নিজের জিনিসপত্তর সামলাতে পারল না ? এত সাবধান করেও সব গেল ? আবার কর্তাবাবাও খুন হতে বসল ?"

মোটের মাথায় বাড়িতে তখন একদিকে 'হায় ! হায় !' আর একদিকে কথার চাষ ।

আর চাঁদু ? গগন বিদীর্ণ করে বলে চলেছে, "তখনই

পুলিশে খবর দিলে চোর ধরা পড়ত । ইচ্ছে করে দেওয়া হল না । মানেটা কী ? হঠাৎ মেজোজ্যাঠার অ্যাকসিডেন্টের কল্পনা পেয়ে বসল কেন অ্যাঁ?"

কিন্তু শ্রীভার্গবের আদুরে ভাইপো চাঁদুটি তাঁর কোন ভাইয়ের পুত্তুর ? কার আবার ? ছোটকর্তা শ্রীভৈরবের । তাঁর গোটাতিনেক মেয়ের পর সবেধন নীলমণি ছেলে চন্দ্রমানিক । ডাকনাম চাঁদু ! জেঠুই তার পৃষ্ঠপোষক । কারণ চাঁদুকে বলা যায় 'প্রহ্লাদকুলে দৈত্য ।' লেখাপড়ার থেকে বেশি দরকারি মনে করে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো । আর সেই বেড়ানোর সুবিধের জন্য ওই জেঠুর কাছ থেকেই একখানা সাইকেল বাগিয়েছে । খুব সাধ ছিল মোটর বাইকের, কিন্তু জেঠুর তাতে সায় ছিল না । বলেছেন, "ওরে বাবা, ওর ছুটে আসা দেখলেই যেন মনে হয় একটা দৈত্য ছুটে আসছে । সাইকেলই ভাল রে বাবা !'

সেই জেঠু মরণবাঁচন হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছেন । তাই চাঁদুর আস্ফালন কেউ তেমন গায়ে মাখছে না । চাঁদু তাই রাগ করে-করে বলে চলেছে, "চেঁদোর কথা আর কে কানে নেবে ? জেঠু থাকলে দেখা যেত !"

বাড়িতে এমন একখানা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল, অথচ থানা-পুলিশ হল না, এটা একটা ন্যায্য ব্যাপার ? এমনও সন্দেহ প্রকাশ করছে চাঁদু, যেন মেজোকাকার ওই পুলিশে অনীহার মূলে কোনও রহস্য আছে । তবে দুঃখের ব্যাপার নিজের মা-বাপের কাছে চাঁদু তেমন প্রশ্রয় পায় না !

হঠাৎ-হঠাৎ তাই বলে উঠছে, "ধুত্তোর । এ-বাড়িতে আর মানুষ থাকে ? চলে যাব একদিন যেদিকে দু' চোখ

যায় ।" তবে জেঠুর একটা হেস্তনেস্ত না হলেও তো যাওয়াটা ভাল দেখায় না । আরও মেজাজ বিগড়ে গেছে, বাড়িতে হঠাৎ মেজোজ্যাঠার নতুন নাতজামাই গৌরব ডাক্তারের সর্দারি দেখে । ডাক্তার বলে কি মাথা কিনেছিস ? খুকুটা আবার সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে "ভাগ্যিস বাড়িতে একটা ডাক্তার-জামাই করা হয়েছিল তাই না বড়দাদু এখনও বেঁচে রয়েছে । চাঁদু কাকার হুকুমে পুলিশ না আসা পর্যন্ত 'টাচ'টি না করলে, ওই উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে থাকতেই কাঠ হয়ে যেত ।" ইস, এমন ভাব করছে যেন ওর বর একটা মরা মানুষই বাঁচিয়েছে । কিন্তু মানুষটা কি সত্যিই বাঁচবে ?

এখনও পর্যন্ত হিসাবের খাতায় বেঁচে আছেই বলতে হচ্ছে, কিন্তু ডাক্তাররা তো আবারও আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা টাইম বাড়িয়ে নিয়েছে । জ্ঞানই যদি না ফেরে, শুধু একটা পাথরের পুতুলের মতো হাসপাতালের খাটে পড়ে থেকে কৃত্রিম উপায়ে খাইয়ে আর শ্বাসপ্রশ্বাস নিইয়ে জিইয়ে রাখাকে কি বাঁচা বলে ?

প্রকৃত ঘটনাটা যখন শুনতে পেল ওরা, মদনা প্রথম নম্বর বলে উঠল, "কী রে টি. সি. হাতগোনা শিখবি ? দেখলি তো তার মহিমা ? ঠাকুরমশাই নিজের এই মারাত্মক ভবিষ্যৎটাই দেখতে পেল না আর তোর-আমারটা দেখতে পাবে ?"

ট্যাঁপা কিন্তু খবরটা শুনে পর্যন্ত ভীষণ মনমরা । "অ্যাঁ, অমন মানুষটার কিনা এই হল ?"

চা-ওলার সেই ছেলেটাকেই আবার ধরেছিল, "অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে চেপে কে গেছে রে হাসপাতালে ? কী হয়েছে তার ?"

সে নিজ ভঙ্গিতে দু'হাত উলটে বলেছে, "গেছে তো বড়কর্তা ওই ঠাকুরমশাই !" কী হয়েছে তা তার জানা নাই । তবে শুনেছে, 'শক্ত কিছু হয়েছে ।' আছে কি নাই ।

"কেন, তোর সেই বন্ধুটা বলেনি ?"

"সে তো—তার বাপের অসুখ বলে দেশে চলে গেছে কাল ।"

তা হলে আর কী করে জানা যাবে আছে কি নাই ? এমন তো চেনা নেই যে, খোঁজ নিতে যাবে ।

ট্যাঁপা বলে, তায় আবার তো দেখি বাঘামতন কে একজন রাতদিন দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করে যেন পাহারা দেওয়ার মতো । তা ছাড়া সেই ভাইপোটা রাস্তায় দেখলে চোঁ করে সাইকেল জোর চালিয়ে যায় ।

মদনা বলে, "করবার কিছু নেই রে । তবে হঠাৎ নাই হয়ে গেলে বাড়িতে আর-একবার কান্নার রোল উঠবে । তাতেই টের পাওয়া যাবে ।"

"খবরটা না জানতে পারলে মনটায় স্বস্তি পাচ্ছিনে রে মদনা ।"

হুঁশে থাকলে বলে এম. কে. বেহুঁশে থাকলে আসল নামটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় । আবার বলে, "কেন মরতে যে সেদিন হাত দেখাতে গেলুম । না গেলে তো

ভালোবাসাটা পড়ে যেত না।"

কিন্তু ট্যাঁপার কপাল বোধ হয় এখন ভালর দিকে, তাই নিট খবর একেবারে নিজে পায়ে হেঁটে তাদের বাড়িতে এসে পৌঁছে যায়।

দরজায় বেল পড়তেই খুলে দেখে হতভম্ব।

দেখে-দেখে-মুখচেনা সামনের বাড়ির সেই নতুন বিয়ের বরটা আর তার সঙ্গে তার শ্বশুরটি। অর্থাৎ শ্রীভার্গবের ভাইপো! মেজোকর্তার বড়ছেলে।

দরজা খুলতেই জামাই বলে ওঠে, "কী মশাই, 'টিকটিকি অফিস' খুলে বসে আছেন, অথচ পাত্তাই পাওয়া যায় না। গোয়েন্দাদেরই গোয়েন্দা লাগিয়ে খুঁজে বের করতে হয়।"

যেমন স্মার্ট চেহারা, তেমনই চোস্ত কথাবার্তা।

মদনা তাড়াতাড়ি বলে, "আসুন আসুন। তবে বসবার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। দয়া করে যদি এই অভাগা নেয়ারের খাটটায় বসতে পারেন।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওতেই হবে। তবে হ্যাঁ, একটু বসা দরকার।"

তারপর শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনি বলবেন?"

তিনি ব্যস্ত হয়ে বলেন, "না না! আমার এসব কথা ঠিক গুছিয়ে বলা—ও তুমিই বলো।"

অতএব জামাই-ই গুছিয়ে বলে।

বাড়ির ঘটনা ও দুর্ঘটনা একটি বিশদ গোছের বিবরণ দিয়ে বলে, "পুলিশ-টুলিসের গাড্ডায় পড়তে চাই না, ওতে শুধু ঝঞ্ঝাটই বাড়ে। কাজ বিশেষ হয় না। অন্তত চোরাই সোনা উদ্ধারের ব্যাপারে। সামনেই যখন আপনারা এমন

একখানা গোয়েন্দা অফিস খুলে বসেছেন, তখন ... ”

ট্যাঁপা ভয়ে ভয়ে মুখ খোলে না । কী বলতে কী বলে বসবে । তবে শ্রীভার্গবের খবরটা পেয়ে শান্তিলাভ করে । প্রাণে বেঁচে আছেন, জ্ঞানও নাকি ফিরছে একবার-একবার, তবে মানুষ চিনতে পারছেন না । ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন ।

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, “আমাদের দিয়ে কাজ হবে বলে মনে করেন ?”

“সেই আশা নিয়েই তো আসা ।”

“আমাদের সম্পর্কে তো কিছুই জানেন না । আমরাই চোর কিংবা জোচ্চোর কি না তার গ্যারান্টি কে দেবে ?”

গৌরব ডাক্তার একটু হেসে বলে, “সে ভারটা আমার নিজের ওপরই রেখেছি । তবে কাজটা আপনারা নেন এটাই একান্ত ইচ্ছে ।”

ট্যাঁপা আর নিজেকে সামলাতে পারে না । ফস করে বলে বসে, “আপনি তো দেখছি নতুন জামাই । আপনার ইচ্ছেয় কাজ হবে তো?”

মদন কটমট করে তাকায় । ট্যাঁপা না দেখার ভান করে ।

গৌরব একটু হেসে বলে, “জামাইয়ের শ্বশুরমশাই তো সঙ্গে এসেছেন । আসলে কালীঠাকুরেরই নয়, এঁর মেয়ের একবাক্স গয়নাও তো হারিয়েছে । তা ছাড়া বাড়ির যিনি প্রধান, এঁদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসার জেঠুর ওই অবস্থাটা কে করল, সেটা জানা দরকার তো ?”

অতঃপর কিছু কথাবার্তা হয় এবং ট্যাঁপা-মদনা বলে ওঠে, “চলুন তা হলে এখনই একবার আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখিগে । তবে এতদিন দেরি করা হল কেন বলুন তো ?”

খুকুরানির বাবা বলে ওঠেন, “দেখুন, জেঠুর ওই অবস্থায় আমাদের কারও মাথাটাথা ঠিক ছিল না । আমার বাবা তো বড়দা বলে অস্থির হন । আর আমার ছোটদা, তিনিও একটু কালীসাধক ! তিনি আবার কালীঠাকুর পড়ে যাওয়ায় খুবই বিচলিত । তা ছাড়া ... ”

একটু থেমে বলেন ভদ্রলোক, “তা ছাড়া ...ওঁর ছেলে চাঁদু আবার পুলিশ ডাকাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিল । এই সব মিলিয়ে দেরি । তবু দেখুন যদি কিছু করতে পারেন ।”

ওরা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওঁদের সঙ্গে সিঁড়িতে নামতে-নামতে হঠাৎ বলে ওঠে, “আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে একটা কমবয়সী কাজের ছেলে ছিল, সে এ-সময় হঠাৎ দেশে গেল কেন ?”

খুকুর বাবা চমকে বলেন, “সে দেশে গেছে আপনারা জানলেন কী করে ?”

“এসব এমনই জানা হয়ে যায় ।”

“ও-বেচারা, বাবা খুব অসুস্থ হওয়ার ”

“দেশ থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম এসেছিল বুঝি ?”

“টেলিগ্রাম ! না, না, ওরা অতসব জানেই না । ওর এক কাকা না কে এখানেই কোথায় থাকে, সে এসে খবর দিল ।”

"কোথায় থাকে ?"

"বলে তো কাছে কোথাকার স্কুলের দরোয়ান ।"

"কিন্তু এরকম সময় কাজের লোককে দেশে যেতে দেওয়া সম্পর্কে আপনাদের কোনও চিন্তা হল না ?"

গৌরব বলে ওঠে, "সেটা আমিও ভেবেছি । তো শুনলাম ছেলেটা নাকি কেঁদেকেটে অস্থির হয়েছিল ।"

ট্যাঁপা গম্ভীরভাবে বলে, "সে তো হবেই । অভিনয়টা জোরালো করতে হবে তো ।"

খুকুর বাবা ব্রহ্মেশ্বর বলে ওঠেন, "না না ! সে একটা নেহাত বাচ্চা ছেলে ! সরল সাদাসিধে ! এমনই বোকা যে, নিজের মাইনেটাও নিয়ে কাছে রাখতে চায় না । বলে, তোমরা রেখে দাও । একদম বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেছল ।"

"তাই নাকি ? কতদিন কাজ করছে ?"

"তা বছর তিন-চার তো বটেই । তবে বয়েসটা তো বড়জোর বারো-তেরো ।"

ওরা নেমে এসে রাস্তায় পড়ে ।

মদন হঠাৎ বলে ওঠে, "তার মানে ওর এতদিনের সব মাইনের টাকা আপনাদের কাছেই গচ্ছিত আছে ।"

ব্রহ্মেশ্বর বলেন, "না, মানে, তা ঠিক নয় । ওই যে বললাম, কাকা ? ওই মাঝে মাঝে এসে নিয়ে যায় দেশে ওর মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দিতে !"

"এ তো চমৎকার ব্যবস্থা । ধরুন, এমনই একসময় সেইভাবে কাকা তাঁর ভাইপো কাছে এসে ঠাকুরের গায়ের

গয়না আর একটা নতুন বিয়ের মেয়ের গয়নার বাক্সটি নিয়ে গিয়ে ... "

ব্রহ্মেশ্বর ব্যাকুলভাবে বলেন, "না না, ওরা খুব ভাল । ওরা এসব কিছুর মধ্যে নেই । দেখছি তো কতদিন ।"

"না থাকলেই ভাল । আপনাদের বিশ্বাসটা প্রশংসনীয় । তবে বাড়িতে এরকম একটা ঘটনার সময় বাড়ির কাজের লোককে দেশে যেতে দেওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ।"

ততক্ষণে সকলে নেমে এসে রাস্তা পার হয়ে শ্রীভার্গবের বাড়িতে এসে পড়েছে । সামনেই চাঁদু । দেখেই তো ট্যাঁপার হাড় জ্বলে গেছে । তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেশ্বরও রাগের গলায় বলে ওঠেন, "আর যত নষ্টের গোড়া হচ্ছেন ইনি । 'পুলিশ ডাকা পুলিশ ডাকা' বলে এত হুজ্জোত করতে থাকল ! আমার তো সন্দেহ ছেলেটা সেই ভয়েই বাপের অসুখ বানিয়ে পালাল !"

ব্যাপারটা ভারী মজার লাগে ট্যাঁপা-মদনার । ভদ্রলোক নিজেই বললেন, "বাপের অসুখ বলে কান্নাকাটি করল ।"

ভেতরে ঢুকে এসে মদনা, "আপাতত এদের কাছে 'মিস্টার দাস', বলে তা ওর সেই কাকাটি কোথায় থাকে ?"

"ওই তো বললাম কাছেই কোন ইস্কুলে দরোয়ানি করে ।"

"ঠিকানা জানা নেই ?"

"হ্যাত । তার ঠিকানা আবার কে জানতে গেছে ? সেই তো আসত ।"

"ও । তো কাছেপিঠের স্কুলেটুলে খোঁজ নেওয়া যায়

না, ওই নামের কোনও দরোয়ান ”

“নাম ? নামই বা কে জানতে গেছে ? লালুর কাকা না লালুর কাকা ।”

“বাঃ । ব্যাপারটা তো বেশ তাজ্জব ।”

হঠাৎ চাঁদুর দিকে তাকিয়ে মিস্টার পাল অর্থাৎ ট্যাঁপা বলে ওঠে, “আপনাকে তো মশাই বেশ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছিল, তো আপনিও এ-বিষয়ে কোনও খোঁজ নিয়ে দেখেননি ? পুলিশ এলে তো প্রথমেই ওদের এই সময় ছাড়ার জন্য যাচ্ছেতাই করত । তা ছাড়া— তাদের পুরো নাম, কাকার ঠিকানা দেশের ঠিকানা সব জানতে চাইত ! লালুর নাম, পদবিটাই বা কী ? তা থেকেও যদি কাকারটা আন্দাজ করা যায় ।”

“না । তাও কারও জানা নেই । লালু না লালু ।”

“দেশ দ্বারভাঙা জেলার কোথায় যেন, এই পর্যন্ত । আর বাপজ্যাঠা চাষবাস করে, এইটা শোনা ।”

ট্যাঁপা যতই ভাবে নীরব থাকবে, ততই ওর মুখ ফসকে কথা বেরিয়ে যায় । তাই বলে ওঠে, “তা একদম বাড়ির ছেলের মতোই যখন, তখন, তার কোনও ফোটো-টোটো নেই ?”

“ফোটো ?”

চাদুঁ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে, “লালুর ফোটো ? আপনারা বুঝি মশাই বাড়ির কাজের লোকেদের ফোটো তুলে বাঁধিয়ে রাখেন ?”

ট্যাঁপা গম্ভীরভাবে বলে, “সে কথা বলা হয়নি । বাড়িতে

বিয়েটিয়ে বা কোনও উপলক্ষ্যে গ্রুপ ফোটো তোলা হলে তো কাজের লোকেদেরও ফোটোর মধ্যে ঢুকে যেতো দেখা যায় । সেই ভেবেই ... ”

ব্রহ্মেশ্বর বলেন, “ তা হয়তো তেমন থাকতেও পারে । তবে সে কি আর কারও মনে আছে ? যাক, ফালতু একজনকে নিয়ে সময় খরচ না করে আসল জায়গায়, ভেতরটা দেখবেন আসুন ।”

ট্যাঁপা গম্ভীরভাবে বলে, “কে বলতে পারে ফালতু না আসল নায়ক ।”

তা বহুক্ষণ ধরে সরেজমিনে তদন্ত চলল ।

যদিও বেশ ক'টা দিন কেটে গেছে, তবে সেই ভয়াবহ ঘরের জিনিসপত্র কিছু নড়ানো-সরানো হয়নি । এমনকী, ঘর ঝাড়ামোছাও করা হয়নি । কারণ পুলিশ এসে যদি বলে কোনওভাবে প্রমাণ লোপের চেষ্টা হয়েছে । এমনকী, সেই যে শ্রীভার্গবের মাথার পাশের দিক থেকে রক্ত গড়িয়ে মাটিতে পড়ে কালো কালো চাপ-বাঁধা মতো হয়ে গিয়েছিল, সে দাগ তেমনই রয়েছে ।

কেবলমাত্র উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মা-কালীকে যে সেদিন তখনই ছোটকর্তা শ্রীভৈরব মাটি থেকে তুলে বেদিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেইটুকুই নড়াচড়া ।

“পুজো-টুজো হচ্ছে না ?”

“কী করে হবে ? দেবী প্রতিমা তো অশুদ্ধ হয়ে গেছেন, চোর-ডাকাত কে ছুঁয়েছে তার ঠিক নেই, তাঁকে শোধন করতে হবে, তবে আবার পুজো । এখন ওই

ছোটকর্তা বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে মা-কালীর একখানি ছবি বসিয়ে পুজোপাঠ সারছেন ।"

ট্যাঁপা হেসে ফেলে বলেছিল, "ঠাকুরও আবার অশুদ্ধ হয়ে যান ?"

"তা যান না ? অনাচার স্পর্শ করলেই যান ।"

হি-হিটা সামলে আবার প্রশ্ন, "তো শোধনটা হবে কী করে ?"

"সেসব নিয়মবিধি আছে ।"

"আসল মালিক শ্রীভার্গব যখন বেঁচেই উঠেছেন তখন, একটু ভাল করে জ্ঞান ফিরলেই তিনি যা বলবেন ।"

"তা হলে এই গোয়েন্দাযুগল কি ঠাকুরের খুব কাছাকাছি গিয়ে একটু দেখতে পারে ?"

"নিশ্চয় ! নিশ্চয় !"

দু'জনেই কাছে গিয়ে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখল । সর্বদা বন্ধ ঘর । শুকনো ফুল বেলপাতার কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে । গা ছমছম করার মতো !

"আচ্ছা, ওঁর বিছানাটা যেমন ছিল, ঠিক তেমনই রাখা আছে ?"

"নিশ্চয় ।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে শুয়ে ছিলেন একটু । যদিও আপনারা বলছেন, সেদিন বিয়ের জন্য অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িতে গোলমাল চলছিল । উনি বোধ হয় আদৌ ঘুমোননি । একেবারে ধ্যানে বসেছিলেন হয়তো ।"

"শুয়ে ছিলেন, তা আপনারা কী করে বুঝলেন

সার ?"

চাঁদুর কণ্ঠে ব্যঙ্গের স্বর ।

"ও আমরা বুঝে যাই । মাথার বালিশের মাঝখানটা দেবে রয়েছে, আর বিছানায় বিছানো ওই নামাবলী-মার্কা চাদরখানা একটু কুঁচকে আছে, এবং লক্ষ করে দেখবেন, একদিকটা একটু ঝুলে পড়ে রয়েছে । হঠাৎ তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে যেমন হয় ।"

এখন সেটা সকলের চোখে পড়ল বটে ।

শ্রীভার্গবের বইপত্র চশমা টর্চ সব দেখাদেখির পর এরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা যে বন্ধ দরজাটা দেখছি ওর ওদিকে কার ঘর ?"

"ওটা, ওটা তো বাথরুম । অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম । বড়দা নিজের সুবিধের জন্য ওটা বানিয়ে নিয়েছিলেন ।"

"মাই গড ! তা বলতে হয় । আমরা ভাবলাম ঠাকুরঘরের পাশে হয়তো ঠাকুরেরই কিছু "

"দরজাটার মাথার দিকে সেকালের মতো একটা শেকল লাগানো রয়েছে । তবে, সেটা বন্ধ করা নেই, এমনই ভেজানো । খুলতেই একটা চাতাল বা প্যাসেজমতো, তারপর বাথরুম ।"

"সেদিন থেকে এটা আর ব্যবহার হয়নি ?"

"না, না ! কে ব্যবহার করবে ?"

ছোটকর্তা বলেন, "বড়দার জিনিস ব্যবহার করবার সাহস নেই কারও ।"

"ভেতরটা তো দেখছি একটু অন্ধকার মতো । লাইট

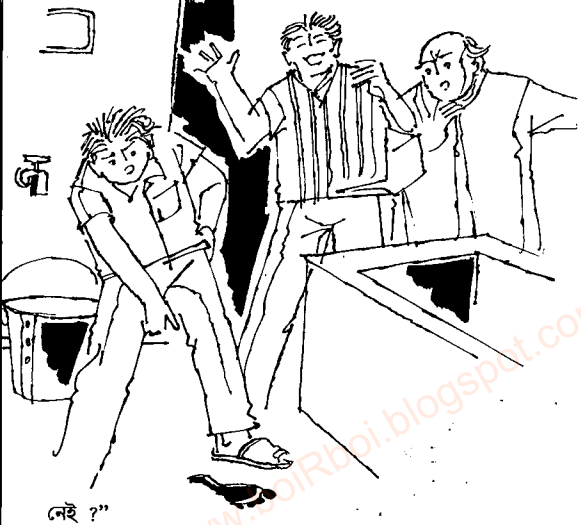

নেই ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে তো ।" বলেই ঘরের দরজার কাছে হাত দিয়ে বলে ওঠে, "আরে, বাল্‌বটা দেখছি ফিউজ হয়ে গেছে ।"

ওরা দু'জনে পকেটে করে নিয়ে এসেছিল ছোট্ট দুটো টর্চ । ছোট্ট কিন্তু জোরালো । যাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মা-কালীকে নিরীক্ষণ করে দেখছিল । সেই দুটোই নিয়ে এল । তবু টর্চটা কাজে লাগল । খুব সাদামাটা একটি স্নানের ঘর । না আছে শাওয়ার, না আছে বেসিন । সবটাই দেশি সিস্টেমে । লাল সিমেন্টের মেঝে । আবার একদম

সেকেলে বাড়ির মতো দেওয়াল-ধারে একদম কোণঘেঁষা একটা সরু চৌবাচ্চা । এ-যুগে আর কেউ স্নানের ঘরে চৌবাচ্চা বানায় না ।

পুরো বাড়িটা অবশ্য এ-যুগের তৈরি নয়, কিন্তু এই স্নানের ঘরটা নাকি সম্প্রতিকালের । একদম স্পেশ্যাল ।

দুই গোয়েন্দার একজন হঠাৎ বলে ওঠে, "আচ্ছা, উনি চৌবাচ্চার পাড়ে উঠে কিছু করতেন ?"

"চৌবাচ্চার পাড়ে উঠে ? বড়দা ? হঠাৎ এমন অদ্ভুত প্রশ্ন ? বড়দার বয়েস সত্তর পার হওয়া, তা বোধ হয় ভুলে যাননি !"

"কিন্তু চৌবাচ্চার পাড়ে একখানা সামান্য কাদাকাদা চটি পরা পায়ের ছাপ !"

চাঁদু হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে বলে, "এই তো ! খাঁটি গোয়েন্দার নমুনা ! অদৃশ্য লোকের পায়ের ছাপ আবিষ্কার ! তাও আবার চটিপরা পায়ের । জেঠুকে কখনও চটি পরে বাথরুমে যেতে দেখেছ কেউ ? অ্যাঁ ? তা ছাড়া ঢুকতেন এই ঠাকুরঘর থেকে, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে । ওঁর হরিণের চামড়ার চটিরও ঠাকুরঘরে প্রবেশ নিষেধ ছিল ।

"সকলেই বলল, "তা ছিল বটে । কিন্তু দাগটাও সন্দেহজনক । ঠিক একখানা চটির মতোই । আবার নিরীক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে বাথরুমের মেঝে থেকে চাতালটা পর্যন্ত প্রায় একই ব্যাপার । বিলীয়মান একটু ছাপ । ঠিক চটির শেপও নেই তাতে ।"

কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারল না, হ্যাঁ তাই তো। ঠিকই তো বলছেন এঁরা।

চৌবাচ্চার তলায় তলানি একটু জল জমে রয়েছে। টর্চ ধরে তার মধ্যে দেখে ট্যাঁপা বলে, "ওর মধ্যে কী একটা ভাসছে।"

"আরে বাবা। কী আবার ভাসবে ?"

চাঁদু আবার ব্যঙ্গ হাসি হাসে, "হ্যাঁ, একেই বলে আসল গোয়েন্দার নমুনা। কী ভাসছে দেখি। আরে, এ যে, হি-হি। একটা টিকটিকি মরা বলে মনে হচ্ছে।"

'টিকটিকি' শব্দটার ওপর বিশেষ একটু জোর দেয়।

অতএব আবারও সবাই এসে ঝুঁকে-ঝুঁকে দেখে। এবং সকলেই রায় দেয় সেইরকমই মনে হচ্ছে। খুকুরানি আবার নাকে কাপড় দিয়ে বলে, "কেমন বিচ্ছিরি গন্ধ-গন্ধ লাগছে রে বাবা।"

গৌরব ডাক্তারও দেখে বলে, "রয়েছে সামথিং।" তবে খপ করে কেউ হাত দিয়ে বোসো না। সবাই বলে একটা কাঠিটাঠি দিয়ে তুলে দেখলে বোঝা যেত। কেউ একজন কাঠি খুঁজতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাঁপা খপ করে সেই ধুলোর সরপড়া চৌবাচ্চার তলানি জল থেকে সেই জিনিসটা তুলে সবাইয়ের সামনে মেলে ধরে। "ওমা! এ তো দেখা যাচ্ছে বেশ বড়ো মাপের একখানা বেলপাতা! জলে পড়ে থেকে পচে গেছে, তবে চেহারাটা বজায় রয়েছে।"

অতঃপর জল্পনা-কল্পনা। তা খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। জেঠু তো অনেকসময় পুজো করতে করতে নিজের মাথার ওপরও ফুল বেলপাতা চাপাতেন। হয়তো চুলে

আটকে ছিল, পরে পড়ে গেছে। চুল তো আছে সত্যি তাঁর, বেশ কিছু ঘাড় অবধি।

তার মানে ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। আর ওই চটিজুতোর ছাপ ? ওটাও অলীক। একজন জোর করে বলছে বলে আর সকলের চোখের ভ্রম। "চলে আসুন মশাই ওর মধ্যে থেকে।"

কিন্তু 'নিঘিন্নে' গোয়েন্দা দুটো ওই বাথরুমেই যেন আটকে গেছে।

ঘরটাতে তো কোনও জানলার বালাই দেখছি না। শুধু উঁচুতে ক'টা ঘুলঘুলি। মনে হচ্ছে যেন গ্রামের বাড়ির ব্যাপার। আসলে একটা ফালতু বাথরুম তো। শস্তামার্কা করে বানানো।

খুকুরানি হেসে ফেলে, "দাদুর ব্যাপার তো। যতসব সেকেলেপনাই পছন্দ।" ছোট্ট একটা কাচের জানলা না রেখে কিনা ঘুলঘুলি। হি হি। দাদু তো চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাননি, তাই মুখে একটু হাসি ফুটেছে।"

"আচ্ছা, ওই ঘুলঘুলির ওপারে দেওয়ালের বাইরে কী আছে ?

"কী আবার ? নর্দমা। কলঘর থেকে যে-জলটা বেরোয় তার জন্যে খানিকটা নালি কাটা আছে বাড়ির আসল জলনিকাশের নালির কাছে পৌঁছে যেতে। এটা তো একটা উটকো দিক।"

"ওদিকে যাওয়া যায় না ?"

"কী আশ্চর্য! তা যাওয়া যাবে না কেন ? বাইরে বেরিয়ে প্যাসেজের দরজা দিয়ে। ওটা তো একটু

পোড়োজমি !"

অবশ্য নালাটালা একটু বাদ দিয়ে বিয়ের দিন তো ওই জমিতেই প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছিল । ডেকরেটরদের কাজের বাহারে ভেতরটা মনে হচ্ছিল ইন্দ্রপুরী । লোকজন খাওয়ার জায়গা হয়েছিল সেটা । কতসব টেবিল-চেয়ার পড়েছিল ভাল-ভাল । এরই একাংশে রান্নাও হচ্ছিল । সেখান থেকে বাতাসে ভেসে যাওয়া চপ ফ্রাই ভাজার গন্ধ ট্যাঁপাকে উতলা করছিল ।

এই জায়গাটা এখন শ্রীহীন হয়ে রয়েছে । যেখানে-সেখানে ডেকরেটরদের পোঁতা বাঁশের জায়গাগুলোয় গর্ত । সারা জমিটায় উড়ে বেড়াচ্ছে পানের খিলির শুকনো মোড়ক, সিগারেটের খালি বাক্স, বিয়ের প্রীতি উপহার মার্কা কিছু পদ্য (যেগুলো হয়তো নেমন্তন্নিদের হাত মোছার কাজে লেগেছিল), পণ্ডিতবাড়িতে তো কেটারারের ব্যাপার নয় যে, তারা হাত ধুতে গরম জল হাত মুছতে কাগজের রুমাল সাপ্লাই করবে । এ হচ্ছে চিরাচরিত হালুইকর ডেকে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড উনুন পাতিয়ে সাবেকি ব্যাপার ।

জমিটার ঘেরা পাঁচিলও ভাঙাচোরা কাদাখোঁচা ।

"এতখানি জমিতে বাগান করেননি আপনারা ?"

"বাগান ! সে আর কী করে হবে । প্রায়-প্রায়ই তো বাড়িতে কাজকর্ম যজ্ঞিবাড়ি । পারিবারিক ব্যাপার তো আছেই, তা ছাড়া জেঠুর ঠাকুরের নানা উপলক্ষে যখন-তখন ভোজ । ওইখানেই প্যাণ্ডেল বেঁধে ..."

বাগানের কথা বলল বটে, কিন্তু গোয়েন্দাবাবুদের মনপ্রাণ টেনে রেখেছে সেই ফালতু বাথরুমের পেছনের

নালা-নর্দমা আর শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল । তাকিয়েই আছে ।

"কী এত দেখছেন মশাই !"

"আচ্ছা, একটু লক্ষ করে দেখুন তো ওই ঘুলঘুলিগুলোর মধ্যেকার দুটো ইট যেন আলগা বসানো মতো ।"

"আলগা বসানো ?" মেজোকর্তা বলেন, "তা হতে পারে !" ফাঁকিবাজ মিস্তিরিদের কারবার তো । ভাল করে মসলা না দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে ।"

মদনা বলে, "সব কিন্তু তা নয় । দেখে মনে হচ্ছে ওখান থেকে দুখানা ইট খুলে সরিয়ে আবার কোনওমতে সেখানে ঢুকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে । দেওয়ালের ঠিক নীচেটায় দেখুন ঝুরো-ঝুরো কিছু রাবিশ পড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ।"

এখানে মেয়েরা কেউ আসেননি । পুরুষরাই এসেছেন । মেজোকর্তা, ছোটোকর্তা, মেজোকর্তার দুই ছেলে ব্রহ্মেশ্বর আর যোগেশ্বর । এবং ছোটকর্তার সবেধন নীলমণি চন্দ্রেশ্বর, ওরফে চাঁদু । তা ছাড়া দলপতি হিসাবে নতুন জামাই গৌরবডাক্তার তো আছেই ।

কর্তাদের কেউ-কেউ গোয়েন্দাদের কথা শুনে ওদের চোখের আড়ালে চুপিচুপি হাসাহাসি করছেন । ওঃ, বাবুরা ভাব দেখাচ্ছেন যেন কতই পাকা গোয়েন্দা । গোয়েন্দা গল্পে-টল্পে দেখা যায় তো, পাকা গোয়েন্দারা যতসব তুচ্ছ চিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আসামিকে শনাক্ত করে বসেন ।

আসলে পাড়ার এই অফিস খুলে বেকার বসে থাকা

ছেলে দুটোকে কেউ মনে-মনে মানিগন্যি করছিল না । নেহাত নতুন জামাইয়ের ঝোঁক প্রাইভেট ডিকেটিভ ডেকে তদন্ত করানোয় । তাই রাজি হওয়া । না হলে পাড়ার জিনিসে কি তেমন সমীহ আসে ? পাড়ার ইস্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করতে মন চায় ? পাড়ার দোকান থেকে পুজোর বাজার করতে ইচ্ছে করে ? পাড়ার ডাক্তারবাবুকে তেমন বড় ডাক্তারবাবু বলে ভাবা যায় !

তা হলে পাড়ার ডিটেকটিভকে-ই বা সমীহ করা যাবে কেন ? তাই আড়ালে হাসাহাসি—বাবুরা গোয়েন্দাগিরি দেখাচ্ছেন ।

যুগলরত্ন ওদের এ-ভঙ্গিটি মনে-মনে বুঝতে পারলেও কেয়ার করে না, তারা ওই নালা-নর্দমার ধারেই যেন আটকে থাকে ।

"আচ্ছা, ওই নালাটার মধ্যেই বা কী বলুন তো ? ওইরকম বেলপাতার মত, তার সঙ্গে চকচক করছে কী যেন ?"

গত দিন চার-পাঁচ শ্রীভার্গবের স্নানের ঘর থেকে জল পড়েনি, কাজে-কাজেই সিমেন্ট বাঁধানো সরু নালাটা এখন ক'দিনের রোদে শুকনো খটখটে । তলায় জমে থাকা শ্যাওলা আর ধুলো মাটির একটা স্তরও শুকিয়ে উঠেছে । তার মধ্যেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুটো পচা বেলপাতা শুকিয়ে আটকে আছে তাতে এবং তার তলায় কী যেন একটু ঝিকঝিক করছে ।

চাঁদু বলে উঠে, "আপনাদের যে মশাই দেখছি বেলপাতা ফোবিয়া ! সর্বত্র বেলপাতা দেখছেন । ওই তো পাঁচিলের

ধারে একটা ঝাঁকড়ামতো আজেবাজে কী যেন গাছ রয়েছে, ঝড়ে বাতাসে তার পাতা উড়ে এসে পড়তে পারে না ? নর্দমার ধার থেকে সরে আসুন তো মশাই । বিচ্ছিরি লাগছে না ?"

ট্যাঁপা ফট করে বলে ওঠে, "ডাক্তারের আর গোয়েন্দার কোনও কিছু 'বিচ্ছিরি লাগছে' বলে সরে পড়লে চলে না । কী বলুন ডাক্তারবাবু ? রুগি দেখতে এসেই তো আপনারা প্রথমেই তাদের হাঁ করিয়ে জিভ দেখেন । সেটা খুব সুচ্ছিরি ? তারপর যা সব জিজ্ঞেস করতে থাকেন, তাও কিছু সুচ্ছিরি নয় । গোয়েন্দাদেরও তাই । আমাদের ওটা দেখতেই হবে ।"

তো হবেই তা বোঝা গেছে । কারণ মদনা কোথা থেকে একটা লম্বা ডাঁটি লোহার খুন্তি কুড়িয়ে এনে শ্যাওলা থেকে সেই জিনিসটা তুলতে চেষ্টা করতে লেগে গেছে ।

মেজোকর্তার ছোট ছেলে যোগেশ্বর বলে ওঠে, " এ কী, আপনি ওই খুন্তিটা কোথায় পেলেন ? সেদিন হালুইকর ঠাকুররা তাদের একটা খুন্তি হারিয়েছে বলে দারুণ চেঁচামেচি করে নগদ পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ।"

মদনা বলল, "ওই তো ওইখানে যে-ক'টা ভাঙা ইট-পাটকেল জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে, ওর কাছে পড়ে ছিল ।"

"দেখছ বাবা ? ভাল করে না খুঁজেই চেঁচামেচি । দেখবি তো ।"

মদনা ততক্ষণে সেই জিনিসটা উঠিয়ে পাশে ফেলে উলটে দেখতে-দেখতে বলে, "ঠিক বলেছেন । সব কিছুই

ভাল করে দেখতে হয় । এই দেখুন তো এই জিনিসটা কী ? সোনার বলেই মনে হচ্ছে ।"

সঙ্গে-সঙ্গে কর্তারা চমকে শিউরে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, "এ কী ! এ যে মা-কালীর নাকের নথ ! হায় । হায় । এ কী কাণ্ড ! ওই অপবিত্র জায়গায় ঠাকুরের নাকের নথ !"

"ওখানে কীভাবে এল ?"

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, "খুব স্বাভাবিক ভাবেই । ওই ঘুলঘুলির ইট দু'খানা সরিয়ে ফোকর করা হয়েছিল, এবং ভেতর থেকে চৌবাচ্চার পাড়ে উঠে হয়তো কোনও পুঁটুলি গোছের কিছু করে ওইসব কত যেন গয়না ছিল বলছেন ঠাকুরের, সেটাকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলা হয়েছিল । হয়তো তার মধ্যে থেকেই একটা ছিটকে পড়ে গেছল । ঠাকুরের গায়ে মাথায় ফুল বেলপাতা-টাতা তো লেগে থাকে !

হঠাৎ ছোটকর্তা ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন, "তা হলে নির্ঘাত সেই ব্যাটা লালুর কাজ । আপনারা ঠিকই বলেছেন দেখছি । বড়দার আদুরে গোপাল সেই মিটমিটে শয়তান সবসময় বোকা সেজে 'দাদুর পূজা দিখি গিয়া' বলে পুজোর ঘরে ঢুকে বসে থাকত । সেই শয়তানই-উঃ । সেই নিয়েছে খুকির গয়নার বাক্স । খুব অন্যায় হয়েছে আমাদের, তাকে দেশে যেতে দেওয়া । আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না এই ডামাডোলের সময় ফাইফরমাশ খাটার লোকটাকে ছাড়া হোক । মেজদার যে আবার দয়ার শরীর । ওঃ আমার যে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ।"

যদিও তাঁর মাথাজোড়াই টাক, তবু এ-ইচ্ছে প্রকাশ

করেন ।

মদনা এবং ট্যাঁপা দু'জনে নিজেরা নিচু গলায় কিছু বলে এঁদের দিকে তাকিয়ে বলে, "একটা ছোটখাটো মই বা উঁচু টুল গোছের পাওয়া যায় না ?"

গৌরবডাক্তার তার শ্বশুরদের দিকে তাকায় । অর্থাৎ পাওয়া যাবে ?

এঁরা ব্যস্ত হয়ে বলেন, "নিশ্চয় । নিশ্চয় । এই তো ওই পাঁচিলের ধারেই তো পড়ে আছে মইটা । গেরস্ত বাড়িতে এসব এক-আধটা তো থাকেই । "চালি থেকে বিছানা পাড়তে কিংবা ..."

'কিংবা' শোনার আগেই মইটা বাগিয়ে নিয়ে এসে সেই ঘুলঘুলির দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে ধরে ট্যাঁপা, মদনা তাতে উঠে পড়ে, এবং আস্তে আস্তে একে একে দু'খানা আলগা ইট নামিয়ে নীচে ফেলে ।

অতঃপর দেখা যায়, সেখানে সত্যিই বেশ একটি ভালমতো ফোকর । অনায়াসেই সেখান দিয়ে কিছু পাচার করা যায় ।

মদন নেমে এসে একটু হেসে বলে, "ব্যাপারটা যে মিস্ত্রিদের ফাঁকিবাজি নয়, সেটা অন্তত বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে ! এখন দেখুন আপনাদের সেই 'ঘরের ছেলেটি'র যদি কোনও পাত্তা করতে পারেন ।"

এঁদের তো লজ্জায় মাথা হেঁট ।

ওদিকে জামাই উৎফুল্ল ।

সেই সোনার নথটাকে ভাল করে ধুয়ে নেওয়ার জন্যে ভেতরে আসে এরা । প্যাসেজের কাছে বাসন মাজামাজির জন্য যে কল আছে তাতে ধুয়ে নিয়ে বলে, "দেখুন, এখন একে কীভাবে ওই শোধন না কী করতে পারেন । না কি ফেলেই দেবেন ?"

"ফেলে দেবেন ?"

"তাই কি আর হয় ? সোনা বলে কথা !"

বাড়ির মধ্যে আসার পর মহিলারা শুনে এবং দেখেও কপাল চাপড়াতে থাকেন । এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে থাকেন, "ইস ! ওইটুকু ছেলের এত সাহস !"

"আহা, ওইটুকু কেন ? এখন তো বোঝাই যাচ্ছে সেই

কাকাটাই নাটের গুরু ।"

চাঁদু জোর চেঁচামেচি করতে থাকে, 'ঠিক হয়েছে । বেশ হয়েছে । সেদিন তখনই পুলিশ ডাকলে, হাতেনাতে ধরা পড়ত । বামালও পাওয়া যেত । কী জানি মেজোকাকার কী মতিছন্ন হল ! যাক এখন আশা করি তার নামে পুলিশে ডায়েরি করে আসা যায় ?"

মদনা হেসে বলে, "আপনারা তো তার কিছুই জানেন না । কী নামে ডায়েরি করবেন ?"

চাদুঁ আরও তড়পায়, "ব্যাটা যেখানে থাকত সেখানেই দেখুক এসে । আমরা তো কেউ দেখিওনি ।"

"কোথায় থাকত ?"

"কেন ? রান্নাঘরের পেছনে কয়লার ঘরটার পাশের ছোট্ট ঘরটায় । কিছু না কিছু হদিস মিলতেই পারে । দেশ থেকে আসা চিঠি, কি মনিঅর্ডারের কুপন-টুপন । যাক, পুলিশে খবর দিতে চললাম আমি ।"

পুলিশ-অনুরাগী চাঁদু যেন আহ্লাদে ডগমগ করতে থাকে । আর চাঁদুর বাবা ছোটকর্তা যত পারেন ঝাল ঝাড়তে থাকেন সেই লালু এবং নিজের মেজদার ওপর ।

খুকুরানি নথটা দেখে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "ঠাকুরের-গয়নাগুলো দাদু একটা লাল শালুর থলিতে ভরে ওই লুকনো জায়গায় রেখে দিতেন । ইস, সেই সোনার মুণ্ডমালাটা সেই ঝকমকে মুকুটটা সেই অত-অত হার আর চুড়িবালা কত কী ! এই নথটা দাদু গত বছর কালীপুজোর সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন । আরও কত-কত সব ছিল ।"

খুকুর ঠাকুমা আরও কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, "আর তোর গয়নাগুলোও তো গেল !"

খুকুরানি অম্লানমুখে বলে, "সে তো তোমরা আবার গড়িয়ে দেবে ।"

খুকুরানির বর গৌরবডাক্তার শুনে থমকে বলে, "আবার দেবেন ?"

"বাঃ । তা দেবেন না ? না দিলে নতুন কুটুমবাড়িতে মান থাকবে ?"

শুনে তো এরা অবাক । কী মেয়ে রে !

ঠাকুমা মলিনভাবে বলেন, "সে তো ঠিক । তবে অনেক টাকার ব্যাপার তো । সে যাক, তোমরা বাবা অনেকক্ষণ খাটলে, কত বেলা হয়ে গেছে, একটু কিছু খেয়েটেয়ে তবে যাও ।"

এরা অবশ্য খুবই 'না না' করল, তবু তিনি ছাড়লেন না ।

এরা অতঃপর ফেরার সময় বলল, "ইয়ে, আপনারা তো রোজই হসপিটালে দাদুকে দেখতে যান, আমরা একবার একটু দেখতে যেতে পারি ?"

"তোমরা ? তা না পারার কিছু নেই ? তবে গিয়ে লাভও কিছু নেই । উনি তো কাউকে চিনতেই পারছেন না । তা ছাড়া কথাবার্তাও যা বলছেন একটু-আধটু কেমন যেন ভুলভাল ।"

"তা হোক । একবার চোখের দেখা দেখি । সেদিন বেশ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলাম ।"

"ঠিক আছে । বিকেলে যাওয়ার সময় ডেকে নিয়ে যাব ।"

হোটেলে যাওয়ার খাটুনিটা বাঁচল ।

চর্বচোষ্য করেই খাইয়ে দিয়েছেন ওঁরা । লুচি তরকারি মিষ্টি এবং মাছভাজা ।

ঘরে এসে জামাজুতো ছেড়ে মদনা বলে উঠল, "কী রে ট্যাঁপা, কী বুঝলি ?"

ফ্ল্যাটটা ভারী সুবিধার । কেউ কোথাও থেকে কথা শুনতে পায় না । অবশ্য হাঁকডাক করলে আলাদা কথা । তবে নিচু গলায় প্রাণ খুলে ডাকনামে ডাকা যায় ।

ট্যাঁপা ততক্ষণে তার নিজস্ব সেই বিখ্যাত নোটবুকটি আর একটা ডট পেন নিয়ে গুছিয়ে বসেছে । বলে উঠল, "আমি যা বুঝলাম তা তো লিপিবদ্ধ করছি । তুই কী বুঝলি ? তোরটা আগে বল ।"

মদনা বলল, "আমার তো মনে হচ্ছে কাজটা ডবল চোরের ।"

ট্যাঁপা বলে, "আমারও সেই ধারণা । দেখি তোর সঙ্গে কতটা কী মেলে ।"

"আচ্ছা, তুই লেখ, পরে পড়ে যাবি আর আমি আমার ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নেব । ততক্ষণে বরং একটু রেস্ট নেওয়া যাক । হেভি খাওয়া হয়েছে ।"

"যা বলেছিস । আহা কতদিন যে অমন গরম-গরম লুচি আর গরম-গরম পাকা পোনা মাছ খাওয়া হয়নি রে মদনা । বাড়ির মেয়েরা বেশ ভাল তাই না ?"

"ভাল প্রায় সকলেই । তবে কিনা—আচ্ছা শুচ্ছি ।"

মদনা শুয়ে পড়ে ।

আর ট্যাঁপা খুদে-খুদে অক্ষরে লিখে চলে—পারিবারিক পরিচয়লিপি—বড়কর্তা শ্রীভার্গব আচার্য । মহাসাধক জ্যোতিষার্ণব । হাফ-নিহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে ।... মেজোকর্তা শ্রীরাঘব ভট্টাচার্য । খুকুরানির আসল ঠাকুর্দা । নিপাট ভাল, মহৎ ব্যক্তি । ...ছোটকর্তা শ্রীভৈরব । শ্যামাসঙ্গীত গায়ক, ভক্ত....তবে বাস্তুঘুঘু । ...বড়কর্তার দুইপুত্র ব্রহ্মেশ্বর ও যোগেশ্বর । অতি সজ্জন । ...ছোটকর্তার পুত্র চন্দ্রেশ্বর বা চাঁদু । জিনিয়াস । তবে কাঁচা । ...গৌরবডাক্তার ভদ্র, সজ্জন এবং অতিশয় বুদ্ধিমান । ...খুকুরানি সেও বুদ্ধিমতী । তবে মেয়ে ভাল । ...বাকি সবাই ভাল । কাজের লোক লালু ? ওটা কোনও ব্যাপারই নয় । ...আমার তো মনে হয়েছে—মদনা ইচ্ছে করেই ওর ব্যাপারটায় প্রাধান্য দেওয়ার ভান করছে, আসল ঘুঘুদের নিশ্চিন্ত রেখে কায়দায় ফেলতে ।

মদনা একটুক্ষণ পরেই আড়ামোড়া ভেঙে উঠে পড়ে বলে, "কী রে ট্যাঁপা ? হল তোর ? কই দেখি ।"

বলে নিজেই ফস করে ওর হাত থেকে নোটবুকটা টেনে নিয়ে বেশ জোরে-জোরে পড়তে থাকে । আর তারপরই ট্যাঁপার মাথায় একটা ছোট গোছের গাট্টা বসিয়ে বলে ওঠে, "ট্যাঁপা রে ! তবু তুই নিজেকে 'দীনহীন' মার্কা মেরে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেজে থাকবি ? এবার থেকে আমিই বলব, আমি মিস্টার টি. সি. পালের অ্যাসিস্ট্যান্ট । আসল কর্তা ইনি । উঃ তুই হচ্ছিস একটা পাকা জিনিয়াস ।

ওই কাজের ছেলেটার বিষয়টাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছিলাম কেন, ঠিক ধরে ফেলেছিস । ওঃ ! এখন বল তো তোর কাকে কী বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে ?"

ট্যাঁপা মুচকি হেসে বলে, "ঠিক তোর যাকে যে বিষয়ে ।"

হাসপাতালের নার্সরা বললেন, "ডাক্তারবাবু তো বলছেন, সবই নর্মাল । এমনিতে খাওয়াদাওয়া নর্মালই চলছে, কিন্তু ব্রেনটাই যেন কেমন ! এখনও মানুষ চিনতে পারছেন না । কথাও উলটোপালটা । যেমন আজ সকালে আমায় বললেন, বুড়োকে খুব তো যত্নআত্তি করছ মা-জননী । বলি ভেতরে কোনও মতলব ভাঁজছ না তো ?"

আমি বললাম, "আমি আর আপনার ব্যাপারে কী মতলব ভাঁজব ? ...তখন ফালফ্যাল করে চেয়ে বললেন, 'তা ঠিক । তা ঠিক । তুমি আর কী মতলব ভাঁজবে !' এ সবের কোনও মানে আছে ? দেখতে এসেছেন দেখে যান ।"

বেশ রাজকীয়ভাবেই শুয়ে আছেন শ্রীভার্গব । স্পেশাল, একটি আলাদা ঘরে । এখানেও তাঁর গায়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে একটি কালীনাম লেখা নামাবলী । তবে রুদ্রাক্ষের মালাটালা কিছু নেই । ট্যাঁপা আর মদনা কাছে এসে দাঁড়ায় । আর যথারীতি ট্যাঁপাই প্রথমে কথা কয়ে ওঠে, "ঠাকুরমশাই, আমাদের চিনতে পারছেন না ?"

ঠাকুরমশাইয়ের চোখের তারায় যেন ফস করে একটা বাল্‌ব জ্বলে ওঠে । একে কী ফ্যালফ্যাল চোখ বলে ?

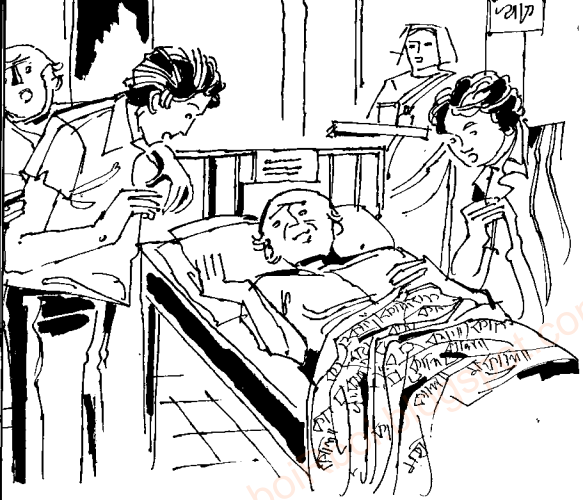

ওরা আর একটু কাছে সরে আসে । ওদের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ওদের আড়ালে পড়ে যান । কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরমশাই সেই ফ্যালফ্যালে, "চিনতে ? না বাবা ! সে অহঙ্কার আর নেই । চেনা কী এত সোজা ?"

মদন বলে ওঠে, "আমরা একদিন আপনার কাছে গেছলাম, মনে পড়ছে ? বলেছিলেন বাড়িতে একটা শুভকাজ আসছে, মিটে গেলে আবার ভাল করে দেখবেন পরে । মনে পড়ছে না ? তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন । আমরা আশা করে আছি ।"

ঠাকুরমশাই কেমন একটু মিটিমিটি হাসি হেসে বলেন, "আর বাবা ! শুভ-অশুভ সব তালগোল পাকিয়ে গেছে । মায়ের খাঁড়াখানায় বোধ হয় মরচে ধরে বসে আছে ।"

সঙ্গে এসেছেন ছোটকর্তা, বাড়ির আর-একজন কে । ছোটকর্তা ট্যাঁপা-মদনাকে প্রায় টেনে সরিয়ে এনে হতাশ গলায় বলেন, "ওই শুনছেন তো ? কথার কোনও ঠিকঠাক নেই । আর ওই মিটিমিটি হাসিটি । প্রায় সবসময় । ওটাও ব্রেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা লক্ষণ, জানেন তো ?"

"তাই বুঝি ? জানি না তো ?"

দু'জনেই বলে ওঠে একসঙ্গে ।

ছোটকর্তা বলেন, "হ্যাঁ তাই । আমার এসব নিয়ে কিছু পড়াশোনা আছে । আর আমাদের ডাক্তার নাতজামাইও তো আমার কথা সমর্থন করল সেদিন ।"

"আচ্ছা । তা আমরা আর কতটুকু কী জানি বলুন ? তো ঠাকুরমশাই, আমরা আজ চলি । তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন ।"

ওরা চলে আসে । ফালতু লোক আর কতক্ষণ ভিড় বাড়াবে ?

বাইরে এসে মদনা বলে, "টি. সি. বুঝলি কিছু ?"

"তা বুঝলাম কিছু !"

"কী বুঝলি ?"

"তুই যা বুঝেছিস, ঠিক তাই ।"

"উঃ ! তোকে আমার এই রাস্তাতেই আকাশমুখো ছেড়ে

উঠতে ইচ্ছে করছে রে মাই ডিয়ার !"

"আমারও সেই একই ইচ্ছে রে মাই ডিয়ার ।"

কিন্তু সব ইচ্ছে তো চটপট পূরণ করা চলে না । অপেক্ষা করতে হয় । ধৈর্য ধরতে হয় ।

তা সেই ধৈর্য ধরার শেষে আবার ওই সামনের বাড়িতে এসে হাজির হয় এম. কে. দাস আর টি. সি. পাল ।

"কী ব্যাপার ? ঘরের মধ্যে থানার ও. সি. বসে যে ? আরও একজন তার সঙ্গে । সেই লালুকে পাওয়া গেছে বুঝি ?"

চাদুঁ প্রায় খিঁচিয়ে বলে, "হ্যাঁ, পাওয়া যাওয়া এত সোজা ? সে ব্যাটা ঘরে কোথাও কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি । এই তো ওঁরা এতক্ষণ তাই বলছিলেন ? ব্যাটা দেখতে হাবাগোবা, ভেতরে-ভেতরে পাকা তাই ধুরন্ধর !"

ট্যাঁপা মৃদু হেসে বলে, "পাকা ধুরন্ধরদের ব্যাপার সেই রকমই হয় । কাঁচা ধুরন্ধররাই চিহ্ন রেখে মরে । মনে নিশ্চিন্ত থাকে সব প্রমাণ লোপ করে ফেলেছি ।...তাই না মিস্টার ও. সি. ? আপনার সঙ্গে তো এর আগেও পরিচয় হয়েছিল, তাই না মিস্টার ? সেই আমাদের ওড়িশার কেসটায় ?"

ও. সি. নড়েচড়ে বসে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে !"

"তা কী হল ? চুরির ব্যাপারে কোনও হদিস পেলেন ?"

ও. সি. রাগের গলায় বলেন, "কী করে পাব ? ওঁরা বাড়িতে একটা চোর পুষে রেখেছিলেন, অথচ তার নামধাম

কিছুই জেনে রাখেননি । একটা কোনও প্রমাণ না পেলে ..."

মদনা শান্ত হাসি হেসে বলে, "আমরা কিন্তু মশাই খেটেখুটে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছি ।"

"অ্যাঁ । তাই নাকি ? পেরেছেন ?"

উপস্থিত সকলেই উৎফুল্ল হন ।

বেশি উৎফুল্ল চাঁদু ! কারণ লালুটা ছিল তার দু'চোখের বিষ । সেটাকে ধরে এনে জেলে পুরে ফেলতে পারলে ...আঃ !

"বলুন । বলুন ।"

সমবেত প্রশ্ন ।

মদনা আর ট্যাঁপা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে । কে বলবে ? দু'জনেই দুজনকে ইশারা করে 'তুই বল' । তথাপি ট্যাঁপা মদনাকেই এগিয়ে দেয় । ভাবটা, তুই বাবা গুছিয়ে বলতে পারিস !

মদনা বলে, "তা হলে—আমাদের বিবরণটা সবাই নীরবে একটু ধৈর্য ধরে শুনুন । ...এই কেসটার প্রথম বক্তব্য এটা খুনের চেষ্টা নয় । ঠাকুরমশাইয়ের ব্যাপারটা স্রেফ অ্যাকসিডেন্টই ।"

"অ্যাঁ । তাই বলছেন ?"

মেজোকর্তা আহ্লাদে লাফিয়ে ওঠেন, "তা হলে তো আমার অনুমানই ঠিক ?"

কিন্তু ছোটকর্তা রেগে উঠে বলেন, "অনুমান আর প্রমাণ এক নয় । প্রমাণটা কী ?"

ট্যাঁপাও স্বভাবছাড়া শান্তভাবে বলে, "আমাদের কিন্তু শর্ত ছিল, কথাগুলো শোনার সময় একটু নীরবতা থাকবে।"

"ঠিক আছে। বলুন।"

মদন আবার খেই ধরে, "হ্যাঁ। ওটা অ্যাকসিডেন্টই। উনি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে কিছু একটা দেখে ওঁর ঠাকুরকে ধরতে গিয়েছিলেন। এবং টাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং ওঁর মাথার ওপর আছড়ে এসে পড়েন ঠাকুর! ওই ধাক্কায় মাথার খানিকটা ফেটে যায়। এমন কিছু বেশি নয়। শুনেছি গোটা কয়েক মাত্র স্টিচ দিতে হয়েছে। চোর বা ডাকাত যে ওঁকে খুন করে জিনিস হাতাতে আসবে, তার আঘাত এত কম জোরালো হবে না, এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, ঠাকুরের মূর্তির গায়ে মাথাতেও ক'জায়গায় বেশ রক্তের দাগ। জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। তার মানে মাথাটা ফাটতেই ফিনকি দিয়ে একটু রক্ত ছিটিয়ে গেছল। এখন গিয়ে লক্ষ করলেই দেখতে পারেন। ...তা হলে? হঠাৎ উনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঠাকুরকে ধরতে গেছলেন কেন? কারণটা হচ্ছে—চোরমশাই উনি ঘুমোচ্ছেন ভেবে নিঃশব্দে ঠাকুরের গায়ের গয়নাগুলো খুলে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন বাড়িতে বিয়ে ছিল, চারদিকে লোক গিসগিস, তার একটু আগেও বাসরে গান হচ্ছিল, অথচ চোর সেই রাত্তিরটাই বেছে নিয়েছিল কেন?...কারণ চোরটি হচ্ছে ওই যে বললেন,

বাড়ির একটা পোষা চোর। সে দেখেছে ঠাকুরের যাবতীয় গয়না সেদিন পরানো হয়েছিল। বাড়ির মধ্যে থেকে শুনেছিলাম ওই একখানা মুণ্ডমালা না কি? সেটাই নাকি পনেরো-ষোলো ভরি। আর গলার একগাদা মালা ও অন্যসব মিলিয়ে পঁচিশ-তিরিশ ভরি। বাড়ির ঠাকুমাই বলেছেন। তা অন্যদিন তো এমন এত সুবর্ণ লাভের সুবর্ণ সুযোগ হবে না! কারণ ঠাকুরমশাই যে ওসব কোনও লুকনো জায়গায় রাখতেন। সেটা তার জানা ছিল না। কাজেই ওই দিনটাই বেছে নেওয়া। তো কথাতেই আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তাই সবকিছু হাতিয়েও নাকে না কোথায় যে ওই একটা নথ না কি পরানো ছিল, সেটাও খুলে নিতে ইচ্ছে হল তাঁর। আর সেইটিই হল কাল। খুলতে গিয়ে খুটখাট কিছু একটা শব্দ হয়েছিল বোধ হয়। ঠাকুরমশাই খুব সম্ভব 'কে? কে ওখানে' বলে বিছানা থেকে চলে এসে ঠাকুর সামলাতে এসেছিলেন, ব্যস, ঠাকুর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়ে ওই ব্যাপার।"

চাঁদুও ট্যাঁপার মতো। বারণ করলেও কথা কয়ে ওঠে। তাই বলে ওঠে, "বাঃ মশাই বাঃ! 'বোধ হয়' আর 'সম্ভবত' দিয়ে বেশ একখানা গল্প ফাঁদছেন দেখছি। শুধু গোয়েন্দাগিরিই করেন না, গোয়েন্দা গল্পও লেখেন?"

মদনা একটু হেসে বলে, "তা লিখলেও হয়, গোয়েন্দাগিরি করতে-করতে অদ্ভুত চমৎকার সব গল্প তো হাতে এসে যায়। যাক তা হলে ওই বানানো গল্পটারই শেষটা শুনুন। নইলে আবার 'আধকপালে' ধরবে। কিন্তু মনে রাখবেন, নো ডিসটার্ব্যান্স। হ্যাঁ বাড়িতে বিয়েবাড়ি

থাকায় আরও অনেক সুবিধের জোগান । ঠাকুরমশাইয়ের ওই বাথরুমটির পেছনে নালাটা থেকে খানিকটা ছাড়িয়েই লম্বা-চওড়া প্যাণ্ডেল বানানো হয়েছে, এই ফালিটুকু লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে গেছে । কাজেই হালুইকরদের একখানা পেল্লায় সাইজের খুন্তি হাতিয়ে এনে ওই প্যাণ্ডেলেরই খুঁটি আঁকড়ে উঠে ঘুলঘুলির দু'খানা ইটকে চাড় দিয়ে খুলে রাখা কোনও ব্যাপারই হয়নি । অতঃপর কোনওমতে থলিতে ভরে নেওয়া গয়নাগুলো চৌবাচ্চার পাড়ে উঠে সেই ফোকর দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিয়ে আবার ভালমানুষের মতো বাথরুমের শেকল তুলে দিয়ে—পুজোর ঘরের দরজা ভেজিয়ে চটপট বাইরে গিয়ে বা জিনিস তুলে ফেলে, যেখানে রাখার রেখে দেওয়া । পরে এক ফাঁকে পাচার । তবে যত নষ্টের গোড়া হল ওই নথটা । সেটাকে আর থলিটলিতে পোরা হয়নি, হাতেই ছিল, সেটাই দিকভ্রষ্ট হয়ে মন্দ জায়গায় পড়ে গিয়েছিল, খেয়াল হয়নি । আর ঠাকুরের মালার সঙ্গে ফুল-বেলপাতা তো আটকে থাকতেই পারে । যাক—প্রথম চোরের গল্প শেষ । সেই গয়নাগুলি বিক্রি করে তিনি হয়তো মনের কোনও অভিলাষ পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখছেন ।"

এতক্ষণ কথা ছিল না কারও মুখে । সবাই যেন পাথরের পুতুল বনে গেছে । এখন ও. সি. ভদ্রলোকের সঙ্গে যে কনস্টেবলটি ছিল, সে বলে উঠল, "প্রথম চোরের গল্প মানে ?"

"তবে হ্যাঁ, ঠাকুরমশাই কী ঘরের দরজা খুলে শুয়েছিলেন ? তা তো শোন না । তা শোননিও । কিন্তু

আগে থেকে যদি কেউ বাথরুমের বাল্‌বটা ফিউজ করে ঢুকে বসে থাকে তার মধ্যে ?"

"শুনুন ! সবটা শুনুন ! আসলে এটি হচ্ছে দুই চোরের গল্প । দ্বিতীয় চুরিটা কী ? সেটা হচ্ছে একবাক্স মানুষের গয়না । নতুন কনের সব কিছু । কনের ঠাকুমা নিজেই বলেছেন, সেসব একটি বাক্সে ভরে তিনি বাড়ির হেড, বড়দার জিম্মায় রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন রাতটুকুর মতো । সকালে নিয়ে নেবেন । তা সকালে তো ওই ঘটনা । সে-বাক্সটি সরানো কিন্তু দ্বিতীয় চোরের । কারণ প্রথম চোর ঠাকুরের বেদির নীচে গাঁথানো ওই লুকানো সিন্দুকের খবর জানত না । তা ছাড়া জানলেও, ওই বাক্সের যা মাপ শুনলাম, ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে চালান করা সম্ভব হত না । কাজেই সে রাত্তিরে সে বাক্স আনটাচ্‌ডই ছিল । এ-ব্যাপারটা ঘটল পরে ঠাকুরমশাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ।"

হঠাৎ ছোটকর্তা তেড়ে বলে ওঠেন, "তা হলে যারা ওই গুপ্ত সিন্দুকের সন্ধান জানত তাদের মধ্যেই কেউ সরিয়েছে । তো জানত তো ওই খুকু আর তার ঠাকুমা ।"

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, "না । আর একজনও জানত, তার কথায় পরে আসছি । খুকুরানি নিজের গয়না নিজে হাতাবেন এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য কি ? তা ছাড়া তিনি তো সেদিন ঘরে ঢুকেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন । তা হলে—তাঁর ঠাকুমা । তাঁরই বা এই অদ্ভুত রিস্‌ক নিতে যাওয়ার দরকার কী ? এর সবই তো শুনেছি উনিই দিয়েছিলেন ভালবেসে । তা ছাড়া এও তো শুনলাম

কুটুমবাড়িতে মান রাখতে নাকি আবার ওসব দিতে হবে । তাঁকে অথবা তাঁর ছেলেকে । বাড়ির সব কিছু দেনেওয়ালা তো তখন জীবনমরণের দোলায় দুলছেন । এখন ভেবে দেখা যাক, ওঁর পক্ষে সে বাক্স সরানো কতটা যুক্তিযুক্ত ! তা ছাড়াও দরজাটা সবসময় কড়া পাহারায় থাকছিল ডবল তালাচাবির মধ্যে । সে চাবি ছিল তাঁর নাগালের বাইরে । কাজেই ওঁকে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় কী ? বাকি থাকেন আর একজন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেই চুরির পাপ ঘটে গেল তাঁর কপালে । তিনি হিসাব করে দেখলেন, ঘরের দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে রাখা চিরকাল সম্ভব নয় । অতএব একফাঁকে দেখে নেওয়া যাক, সেখানে টাকাকড়ি আর কিছু আছে কি না । তা ছিল । টাকাও ছিল বেশ কিছু । কিন্তু ওই বাক্সটা যে এমন উপরি পাওনা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেননি বোধ হয় । দেখে তাজ্জব । তবে খুব সম্ভব এটাই ভেবেছিলেন তিনি, এও ওই কালীঠাকুরেরই সম্পত্তি হবে হয়তো । ভক্তরা তো দিয়েটিয়ে যায় । বাক্সর আসল ইতিহাসটা তখন পর্যন্ত তাঁর অজানা । কিন্তু সরিয়ে ফেলার পর তো আর কিছু করার থাকে না । তাকে কলকাতাছাড়া করে রেখে এসে আবার এনে যথাযথ রাখা সম্ভব নয় । কাজেই দশচক্রে ভগবান ভূত । এই হল আমার দ্বিতীয় চোরের গল্প । তবে চোরেদের হাতে হাতকড়া লাগাবার অধিকার তো গোয়েন্দাদের থাকে না । তাদের তো শুধু সন্ধান দিয়েই থেমে যেতে হয় ।"

হঠাৎ গৌরবডাক্তার বলে ওঠে, "মাপ করবেন, সন্ধান দেওয়াটা হল কোথায় ? আপনারা তো চমৎকার দুই চোরের

কাহিনী শোনালেন মাত্র । একনম্বর চোর যদিবা ওই লালুই, দু'নম্বরটি ..."

"লালু ? না না । সে একটা ইনোসেন্ট বয় । তবে তাকে আচ্ছা করে পুলিশের ভয় দেখানো হওয়ায় সে ছুতো করে পলায়ন দিয়েছে । ভয়টা দেখিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় চাঁদুবাবু । কারণ একটা সন্দেহজনক লোক খাড়া করা তাঁর দরকার ছিল । তো চাঁদুবাবু আপনার কিন্তু একূল-ওকূল দু'কূল গেল ।"

"তার মানে ? আপনি বলতে চাইছেন কী ?"

"যা ঘটেছে সেটাই বলতে চাইছি । ঠাকুরের ওই গয়নাগুলো ঝেড়ে দিয়ে সেই টাকায় বম্বে পালিয়ে গিয়ে ফিল্মস্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে যে প্রাণের বন্ধুটির সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন, তিনি সেগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে একাই বম্বে পাড়ি দিয়েছেন আজ ভোরের ফ্লাইটে । আপনার প্যান্টের পকেটে, সন্ধ্যার ফ্লাইটের টিকিট ! যেটা আপনার প্রাণের বন্ধু কিনে আপনাকে দিয়ে গেছলেন গতকাল সন্ধ্যায় ।"

"মিথ্যে কথা । মিথ্যে কথা !" বলে চেঁচিয়ে ওঠে চাঁদু । কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙেও পড়ে । তার প্যান্টের পকেট থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে সন্ধ্যায় বম্বেগামী একটি প্লেনের টিকিট । নিজের সঙ্গে রাখাই সবচেয়ে সেফ ভেবেছিল চাঁদু !

এখন সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে চেয়ারে । মনে হচ্ছে ফুলে-ফুলে কাঁদছেও হয়তো । ধরা পড়ার সর্বনাশের ওপর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার খবর । যাকে বলে,

মরার ওপর খাঁড়ার ঘা ।

কিন্তু দ্বিতীয় চোর ?

খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, এ-বাড়ির সব থেকে বাঘা ব্যক্তিটিই ওই ঘটনাচক্রের শিকার । যিনি এই হতভাগ্য প্রথম চোরের পিতা !

ছেলের মমান্তিক অবস্থা দর্শনে তিনি অবশ্যই ভেতরে-ভেতরে এলিয়ে গিয়েছিলেন । তবু একবার তেড়ে ওঠার চেষ্টা করেন, "কী বলছেন ? কী ভেবেছেন আপনারা ? জানেন, এর জন্যে আমি মানহানির কেস ঠুকতে পারি আপনাদের নামে ।"

ট্যাঁপা হঠাৎ হি-হি করে হেসে উঠে বলে, "তা হয়তো পারেন । তবে তার আগে আপনাকে তো এ-হিসাবটা দিতে হবে, যখন আপনার বড়দার ক্রাইসিস চলছে, তখন আপনি হঠাৎ শেয়ালদা স্টেশনে চলে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে ব্যারাকপুরে চলে গেলেন কেন ? অবশ্য ওখানে চাঁদুবাবুর এক মাসির বাড়ি । মানে আপনার শ্যালিকার বাড়ি । কিন্তু সেটা তো ঠিক শ্যালিকার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার সময় নয় । যখন পড়িমরি করে আবার তক্ষুনি ফিরে আসতে হবে । তা ছাড়া শ্যালিকার বাড়ি যাওয়ার সময় কলকাতার নামী দোকানের সন্দেশের বাক্স হাতে নিয়ে না গিয়ে, বিশ্রী একটা চটের থলিতে চারটি মুলো বেগুন ডাঁটাপাতা নিয়ে গেলেন কেন ? এ জবাব লোকে চাইবেই ।"

তাগড়াই চেহারার শ্রীভৈরবও হঠাৎ মুখ ঢেকে বসে পড়েন ।

ট্যাঁপা বলে ওঠে, "সাধে কি আর ঠাকুরমশাই বলে চলেছেন 'কাউকে আর চিনতে পারছি না । মানুষ চেনা সোজা নয়' । "

থানার ও. সি. বললেন, "কেসটা কার নামে ফাইল হবে ?"

মেজোকর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, "কারও নামেই নয় । কেস হবে না ।"

"বাঃ । মার্ভেলাস ! জানেন আমাদের ফর নাথিং হ্যারাশ করাটা রীতিমত ..."

"জানি । ফাইনযোগ্য অপরাধ । দেওয়া যাবে । কত দিতে হবে বলুন ?"

তারপর মেজোকর্তা ট্যাঁপা-মদনার দিকে তাকিয়ে

বলেন, "এখন এই যুগলরত্নটিকে কীভাবে পুরস্কৃত করা হবে বলুন সবাই।"

এরা বলে ওঠে, "কী আশ্চর্য! আমরা আবার করলাম কী? আমরা তো শুধু দুটো গল্প বানিয়ে শোনালাম। তাই না চাঁদুবাবু?"

গৌরবডাক্তার বলে, "তা ভাল গল্প শোনালেও তার দাম মেলে। ঠিক আছে, আপনাদের যুগলরত্ন অফিসঘরটাকে সোফা-টোফা দিয়ে সাজিয়ে আসা যাবে। যাতে মাঝে-মাঝে গিয়ে জুত করে বসে আড্ডা দেওয়া যায়। আর আপনাদের অভিজ্ঞতার গল্পগুলো শোনা যায়।"

বাড়ি ফিরে ট্যাঁপা হঠাৎ সেই অনেক-অনেকদিন আগের মতো কোমরে হাত রেখে একপাক নেচে নিয়ে বলে উঠল, "মদনা রে, সময়টা বোধ হয় আমাদের ভালই এসেছে। বলতে গেলে বিনি খাটুনিতেই দু-দুটো চোরকে কাত করে ফেলা গেল।"

তা একরকম বিনা খাটুনিতেই! একটা দৈবাৎ-এর দয়ায়, আর একটা ভাঁওতার গলাবাজিতে। ...দৈব ছাড়া কী? শস্তা মার্কা দু'খানা চেয়ার-টেয়ার মেলে কি না দেখবার জন্য শেয়ালদা বাজারের দিকে যেতে গিয়েই না যুগলরত্ন বা রত্নযুগল ওই ছোটকর্তাকে একটা চটের থলি হাতে স্টেশনে ঢুকতে দেখে তার পিছু নিয়েছিল। ব্যাপারটা কী? কলকাতা থেকে শাক বেগুন মুলো ডাঁটা কিনে নিয়ে কি কেউ মফস্বলে যায়। তাও আবার ছোটকর্তাদের বাড়ির অবস্থা যখন এমন।

নির্ঘাত ব্যাপার অন্য। ওগুলো ছলমাত্র। লোককে ধোঁকা দেওয়া। ওই মুলো-বেগুনের তলায় অন্য জিনিস রাখা আছে নিশ্চয়। কাজেই ওরা ধরেই নিয়েছিল এটা চোরাই জিনিস পাচারের ব্যাপার। আর অন্য চোরের ব্যাপারটায়? সেও সামান্য ব্যাপার।

বড়কর্তার বিপর্যয়ের আগেই ট্যাঁপা-মদনা দেখেছে, একটা চকরাবকরা জামাপরা লক্কামার্কা ছেলের সঙ্গে ওই চাঁদুবাবুর যখন-তখন ফুসফুস-গুজগুজ। বেশিরভাগ সময় মস্তানটিকে চাঁদুর সাইকেলের পেছনে বসে আনাগোনা করতে দেখেছে। একদিন দেখে ছেলেটা তাদের 'সুস্বাস্থ্য হোটেল'-এ ঢুকে জিজ্ঞেস করছে, চা পাওয়া যায় কি না।

পাওয়া যায় না শুনে মেজাজ খারাপ করে বেরোবার সময় চাঁদুকে বলে উঠেছিল ছেলেটা, "বম্বে গেলে দেখবি কী একখানা শহর।"

তখনও এদের কাছে ডাক আসেনি। কিন্তু কথাটা মনে ছিল। তারপর তো এই ঘটনা। এখন গতকাল কখন যেন একবা'র ছেলেটাকে দেখতে পেয়েছিল ওদের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে। তারপর চাঁদু বেরিয়ে এল। কী যেন কথা হল। চাঁদুর মুখে আলো ফুটে উঠল যেন। এই টুকরো দৃশ্য জুড়েই গল্পটা খাড়া করা।

তবে সত্যিই যে চাঁদুর পকেটে প্লেনের টিকিট পাওয়া যাবে এমন আশা করেনি এরা। স্রেফ ভাঁওতা দিতে ধমক মেরেছিল মদনা। ভেবেছিল ওই ধমকেই বোঝা যাবে অপরাধী ঘাবড়ে যাবে কি না। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার খবরে বিচলিত হতেই পারে। আসলে সেই বন্ধু হয়তো সন্ধ্যাবেলা

এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে তার প্রাণের বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে-করতে দেখবে প্লেন আকাশে উড়ে গেল ।

ট্যাঁপা বলল, "ভাঁওতাতেও তা হলে কাজ হয়, অ্যাঁ ?"

"সময়বিশেষে । আর সাহস দেখাতে পারলে । তবে ক্যালকুলেশনটা ঠিক হওয়া চাই ।"

ট্যাঁপা আর একবার ডাক ছাড়ল, "মদনা রে । সেদিন কিন্তু ওই ঠাকুরমশাই বলেছিল, সামনে একটা ভালমতো ইয়ে সাফল্য আসছে । ফলল তো ?"

মদনা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু নিজের ব্যাপারেই বুড়ো ভদ্দরলোক অমন হেরে গেল ..."

"আহা ! কাল গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করতে শুনলি না, বললেন, নিজের হাত নিজে দেখতে নেই ! ওঁদের শাস্ত্রের নিষেধ ! তবে বাড়ির লোকের সামনে দাদু বেশ অ্যাকটিং চালিয়ে যাবেন । দেখে বুঝলি ? ভাব দেখাচ্ছেন, যেন এখনও ঘোর কাটেনি । দেখিস পরে ঠিক আমাদের হাত দেখে ঠিকঠাক সব বলে দেবেন । কী অন্ধকারে আছি আমরা বল ? কবে জন্মেছি, তার হিসাব জানা নেই । কার কী বয়েস তা জানা নেই । জীবনে যতই সাফল্য আসুক । মনে হবে যেন পায়ের তলায় মাটি নেই । বল ঠিক কি না ?"

মদনা বলে, "ঠিক ! খুব ঠিক ।"

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900